11:02 32° • 40%
[S] Read without ads. Subscribe with a fr
10 / 56

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব মহাপ্রভুর পূজা ও রথযাত্রা

নিবেদন

ধ্যান-জপ এবং স্তব হলো সাধনার পন্থা স্বরূপ। আর্য্য ঋষিগণ ইষ্টদেবের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য যে আত্মনিবেদন করিয়া গিয়াছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ব্যবধান দূর করিয়া আজও তারা অবিনশ্বর রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তিমার্গে যাঁহারা ইষ্টলাভ করিয়া জীবন ও সাধনা সার্থক করিতে চান—ধ্যান-জপ-স্তব তাঁহাদের সাধনার পন্থা।

সেজন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর ও রথযাত্রার কাহিনী শুরু করার পূর্বেই প্রথমেই গুরুস্তোত্রম্ ও পরে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার ধ্যান এবং জগন্নাথ দেবের স্তোত্রম্ লিখিত হইল।

গুরুস্তোত্রম্

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যেন কৃৎস্নং চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

Ad Download to read ad-free
[S] Read without ads. Subscribe with a free trial
Overview Find in PDF Related do
Download
Scanned with OKEN Scanner

চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন-সমুদ্ভাসিতমূর্ত্তয়ে।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদকলাতীতস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়স্তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অনেকজন্মসম্প্রাপ্ত-কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানাগ্নিদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ প্রাপনং সারসম্পদঃ।
যস্য পাদোদকং সম্যক তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরু পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমাম্যহম্॥

ইতি শ্রীগুরুস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

Scanned with OKEN Scanner

জগন্নাথ-স্তোত্রম্

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতক-রবো
মুদাভীরীনারীবদন কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা শম্ভু ব্রহ্মাসুরপতি গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং, কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদ্‌ধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমা বাণী রামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখৈঃ।
সুরেন্দ্ররারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথিমিলিতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্ব্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো! দীননাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদম
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমুখপদ্মবিনির্গতং শ্রীজগন্নাথাষ্টকং সমাপ্তম্।

জগন্নাথের ধ্যান

পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণম্।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্।
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ।
সেব্যমানং সদা চারুকোটিসূর্য্যসমপ্রভম্।
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গলফলপ্রদম্।

প্রণাম— জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাধিনাশক।
জয়াশেষজগদ্বন্দ্যপাদাম্ভোজ নমোঽস্তু তে।

বলদেবের ধ্যান

বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্।
কৈলাসশিখরাকারং ফণাবিকটবিস্তরম্।
নীলাম্বরধরঞ্চাগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্।
মহাবলং বলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্।

প্রণাম— প্রসন্ন করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
চরাচরসমাকীর্ণা ধৃতা যেন বসুন্ধরা।
পরাপরাণাং পরম পরমেশ নমোঽস্তু তে।

প্রকারান্তর— বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভম্।
বামে হলায়ুধধরং দক্ষিণে মুষলং করে।
হালালোলং নীলবস্ত্রং হেলালন্তং স্মরেৎ পরম্।

প্রকারান্তর— শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং মুক্তাম্বুজদলেক্ষণম্।
নীলচেলধরং স্নিগ্ধং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
কুণ্ডলাশ্লিষ্টসদ্গণ্ডং দিব্যভূষাম্বস্রজম্।
মধুপানে সদা সক্তং মদাঘূর্ণিতলোচনম্।
মুষলং দক্ষিণে পাণৌ বলরামং সদা স্মরেৎ।

প্রণাম— নমস্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে বেরতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল।
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ।

Scanned with OKEN Scanner

সুভদ্রার ধ্যান

সুভদ্রং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিচিত্রবস্ত্রসংচ্ছন্নাং হারকেয়ূরশোভিতাম।
বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহারবিলম্বিতাম্।
পীনোন্নতকুচাং রম্যামাদ্যাং প্রকৃতিরূপিকাম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়োত্তামম্বিকাং পরাম্।

প্রণাম— জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ ভবভাবিনি।
কার্য্যাকার্য্যস্বরূপাণাং স্মরণানাঞ্চ কারিণীম্।
ধারণাং ধার্য্যমাণানাং ত্বামাদিং প্রণমাম্যহম্।

রথযাত্রা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজা

নিয়ম—আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়াতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে; এজন্য সেই দিনে যাত্রা, মহোৎসব ও বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যদ্যপি দ্বিতীয়া পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা না হয়, তথাপি তিথিমাহাত্ম্য জন্য উক্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য, ইহাতে ভগবানের অত্যন্ত প্রীতি হয়।

পূজাবিধি—প্রথমে নিত্যক্রিয়াদি করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্বক, 'সূর্য্যঃ সোমো' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে উত্তর মুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণুলোকগমনকামো গণপত্যাদিনানা-দেবতাপূজাপূর্ব্বক— শ্রীকৃষ্ণস্য রথোৎসবযাত্রামহং করিষ্যে।

তাহার পর কিঞ্চিৎ আতপতণ্ডুল ছড়াইয়া হাতজোড় করিয়া 'ওঁ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু' এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

Scanned with OKEN Scanner

তাহার পর স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া আসনশুদ্ধি করিবে।

যথা—নিজের আসনে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে এতে গন্ধপুষ্পে 'হ্রং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ' বলিয়া একটি পুষ্প দিয়া আসনে হাত রাখিয়া পাঠ করিবে;—

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনপরিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রঃ কুরু, চাসনম্।।

এই বলিয়া আসনশুদ্ধি করিবে। অনন্তর আতপতণ্ডুল গ্রহণ করিয়া, সেই আসনের দশদিকে ছড়াইয়া ঊর্দ্ধে তালত্রয় দিয়া, তুড়ি দিয়া দশদিক বন্ধন করিতে হইবে। তাহার পর, আসনে উপবেশন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বামে—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর-গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ গণপতয়ে নমঃ। মধ্যে—ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবে।

তাহার পর সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি-নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে; যথা—

বাং হৃদয়ায় নমঃ। বীং শিরসে স্বাহা। বুং শিখায়ৈ বষট্। বৈ কবচায় হুং। বৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস—যথা—বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। বুং মধ্যামাভ্যাং বষট্। বৈং অনামিকাভ্যাং হুং। বৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অতঃপর বামহস্তমধ্যে একটি পুষ্প রাখিয়া, বামহস্তোপরি দক্ষিণহস্ত আচ্ছাদন করিয়া ধ্যান করিবে।

জগন্নাথের ধ্যান—ওঁ পীনাঙ্গং দ্বিভুজাং কৃষ্ণং পদ্মপত্রারতেক্ষণম্। মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্।। শঙ্খ-চক্র-গদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণম্। সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্।

দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষ-বিদ্যাধরোরগৈঃ। সেব্যমানং সদা দারু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্। ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥

এই ধ্যান পাঠ করিয়া, বামহস্তের পুষ্পটি মস্তকে রাখিয়া, মনে মনে যথা সম্ভব উপচার দ্বারা উক্ত দেবকে পূজা করিবে। অনন্তর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। তাহার ক্রম যথা,—স্ববামে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, তাহার উপরি ত্রিপদিকা রাখিবে। তৎপরে শঙ্খাদি পাত্র বামহস্তে ধারণ করিয়া 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, গৃহীত দক্ষিণ হস্ত জলদ্বারা, তৎশঙ্খাদি পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তদুপরি রাখিবে। তৎপরে 'নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ত্রিভাগ জলদ্বারা তৎপাত্র পূরণ করিবে তৎপরে,—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তজ্জলে তীর্থ সকলকে আবাহন করতঃ 'বাং' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, দূর্ব্বা, তণ্ডুল, গন্ধ, তুলসী সেই শঙ্খাদিপাত্রে রাখিয়া ধেনুমুদ্রা, অস্ত্রমুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া 'বাং' এই মন্ত্র দশবার তদুপরি জপ করিবে। তৎপরে সেই অর্ঘ্যপাত্রের কিঞ্চিৎ জল পূজার কোশার জলে লইয়া ঐ জল আপনার মস্তকে এবং পূজার যে সমস্ত দ্রব্য তাহাতে ছিটাইয়া দিবে।

তৎপরে পীঠ পূজা করিবে। পুনর্ব্বার ধ্যান করতঃ ষোড়শোপচারে দেবতাকে পূজা করিবে। সকল পূজারই এই নিয়ম, কেবল দেবদেবীর মূলমন্ত্র পৃথক পৃথক।

বলভদ্র ধ্যান---ওঁ বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শরদিন্দুসমপ্রভম্ কৈলাসশিখরাকারং ফণাবিকটবিস্তরম্। নীলাম্বরধরঞ্চোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্। কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্। মহাবলং হলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্।

সুভদ্রাধ্যান---ওঁ সুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্ চিত্র-বস্ত্রসমাচ্ছন্নাং হারকেয়ূরশোভিতাম। বিচিত্রাভরণোপেতা

মুক্তাহারবিলম্বিতাম্। পীনোন্নতকুচাং রম্যাং সাধ্বীঃ প্রকৃতি রূপিকাম্। ভক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তামম্বিকাং পরাম্॥

জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা সকলেরই ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। পরে সারথিকে পূজা করিবে। অতঃপর হোম করিবে। তৎপরে স্তুতি পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে।

ওঁ দেব-দেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক। ভক্তানুগ্রাহক সদা রক্ষ মাং পাপতো নরম্॥ ১॥ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন। জয়াশেষজগদ্বন্দ্যপাদাম্ভোজ নমোহস্তু তে॥ ২॥ জয় ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ বেদ-নিশ্বাস ধারক। অশেষজগদাধার পরমেশ নমোহস্তু তে॥ ৩॥ জয় ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদিবৌঘপ্রণতার্ত্তিনুৎ। জয়াখিলজগদ্বন্ধো অন্তর্য্যামিন্নমোহস্তু তে॥ ৪॥ জয় নির্ব্ব্যাজকরুণ অশেষদীনবৎসল। দীননাথৈকশরণ বিশ্বসাক্ষিন্নমোহস্তু তে॥ ৫॥

জগন্নাথস্তুতিঃ---ওঁ **জয়খিলজগত্তার-ধারণশ্রমবর্জ্জিত।** তাপত্রয়বিকর্ষায় মহাহলবতে সদা॥ প্রসন্ন করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে। চরাচরময়ী যেন ধৃতা নিত্যং বসুন্ধরা॥ মামুদ্ধরস্ব দুষ্পারাদস্তোধেরেণসো বিভো। পরাপরাণাং পরম পরমেশ নমোহস্তু তে॥

বলভদ্রস্তুতিঃ—ওঁ জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ ভবভামিনি। কার্য্যাকার্য্যস্বরূপাণাং কর্ম্মণাঞ্চ বিধায়িনি॥ ধরাণাং ধার্যমানানাং ত্বামম্বাং প্রণমাম্যহম। সুভদ্রাং রুদ্ররূপাঞ্চ গুণভূতাং নমাম্যহম্॥

সুভদ্রাস্তুতিঃ—অতঃপর রথোৎসর্গ করিয়া দেবতাকে রথে স্থাপনপূর্ব্বক সপ্তধা প্রদক্ষিণ করিয়া জয় জয় ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন পূর্ব্বক সপ্তধা বা ত্রিধা রথচালনা করিবে। অতঃপর সায়ংসময়ে স্বমন্দিরে আনিয়া অভিষেক করতঃ হোম করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে।

দশমীতে পুনর্যাত্রা করিবে, কাহারও মতে নবমীতে পুনর্যাত্রা, এই প্রকার দেখা যায়।

ইতি রথযাত্রাপদ্ধতি সমাপ্ত।

পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর কাহিনী

যে সময় বাঘের তীরে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ শোনা গেল, তখন পাণ্ডবগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হয়ে যান। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে পাঠালেন শ্রীশরীরের পর যে সামান্যতম অংশ অবশিষ্ট ছিল, তা একটা কৌটায় ভর্তি করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল যে, সেই কৌটা স্রোতের উজান ঠেলে ক্রমশঃ এগোয়ে থাকে, যেখানে শবররাজ বিশ্ববসু তর্পণ করছিলেন সেখানে এসে থেমে গেল। বিশ্ববসু চক্ষু খুলে দেখেন যে কোথা থেকে একটা কৌটো এসে তাঁর গায়ে লেগেছে। তিনি বার-বার সেই কৌটাটি ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকেন কিন্তু যতবারই ফেলে দেন ততবারই তাঁর গায়ে এসে লাগে। অবশেষে বাধ্য হয়ে সেই কৌটো এক জায়গায় রেখে দিলেন

নীলমাধবের আবির্ভাব

একদিন রাত্রে বিশ্ববসু ঘুমাচ্ছেন, রাত্রে স্বপ্নাদেশ হলো," আমি 'নীলমাধব'। আমাকে কোন গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে, আমার পূজা কর। যদি কেউ জানতে পারে তাহলে আমাকে নিয়ে চলে যাবে।"

মহানদীর তীরে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে সেই কৌটাটি রেখে দিয়ে শবররাজ বিশ্ববসু নিত্য নীলমাধবের পূজা শুরু করলেন। বাড়িতে একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। কোন্ ভোরে উঠে বাড়ি থেকে চলে যান। আবার সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে আসেন। এইভাবে দীর্ঘদিন কেটে যাবার পরে 'নীলমাধব' উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বপ্ন দে "আমি 'নীলমাধব'; আমাকে তোমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করো! বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত আমার মন্দির সমুদ্রের গর্ভে বালি ঢাকা আছে।

উপর ঘোড়া ছোটালে, সব ঘোড়া সেখানে হোঁচট খেয়ে পড়বে! সেইখানে খোঁড়। সমুদ্রের জলে তিনটে নিম কাঠ ভেসে আসবে! একজন বৃদ্ধ কারিগর আসবেন (মতান্তরে বিশ্বকর্মা)। তাঁকে দিয়ে আমার মূর্তি করাবে।"

রাজা 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' সকালে উঠে নীলমাধবের জন্যে 'চর' পাঠালেন। আর রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন, যে নীলমাধবের সন্ধান এনে দিতে পারবে তাকে মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

সমুদ্র গর্ভে ঘোড়া ছুটিয়ে নীল মাধবের মন্দিরের স্থান নির্দেশ করা হলো। সেখানকার বালি সরিয়ে মন্দির বাহির করা হলো। অপূর্ব সেই মন্দিরের কারুকার্য।

জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরির প্রস্তুতি

একদিন সমুদ্রে তিনটি কাঠও ভেসে এলো। একজন বৃদ্ধ কারিগরও এসে পৌঁছলেন। তিনি বললেন,"আমি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মূর্তি তৈরি করবো। কোনরূপ বাধা হলে, সে মূর্তিতে আমি আর হাত দেবো না।"

কারিগর দরজা বন্ধ করে মূর্তি তৈরির কাজ আরম্ভ করলেন। বাইরে থেকে একটা শব্দ শোনা যেত। কিন্তু একুশ দিনের মাথায় (মতান্তরে পনের দিন) কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে, রাজা বন্ধ দরজা খোলার আদেশ দেন এবং কৃষ্ণ, বলরাম ও মাঝখানে সুভদ্রার অসমাপ্ত মূর্তি দর্শন করেন। কিন্তু সেখানে কারিগরের হদিস পাওয়া যায় নাই।

এদিকে বিশ্ববসুর কুটিরে বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন। বিশ্ববসুর অনুপস্থিতিতে ব্রাহ্মণের অন্যতা জানা, ব্রাহ্মণকে অনেক আদর যত্ন করে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যা মা! তোমার আর কে আছে?

Scanned with OKEN Scanner

মেয়েটি বলে, "বাবা আছেন। তিনি নীলমাধবের পূজা করেন। প্রতিদিন ভোরে উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন।" বিদ্যাপতি 'নীলমাধবের' নাম এই দুইবার শুনলেন। তিনি মেয়েটিকে রাত্রি বাসের জন্য প্রস্তাব দিলেন। মেয়েটি বললো, "বাবা যদি বলেন, তবেই থাকবেন। আমি কিছু বলতে পারবো না।"

সন্ধ্যায় বাবা যখন বাড়িতে এলেন মেয়েটি সব কথা বাবাকে বললো। বাবা বললেন, "ওনার কিছু যদি অসুবিধা না হয় তাহলে থাকতে পারেন।"

পরের দিন ব্রাহ্মণ মেয়েটিকে বললেন, "নীলমাধবকে একবার দেখাবে।" "ওরে বাবা! খবরদার ওকথা বাবাকে বলবেন না। তাহলে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গেই তাড়িয়ে দেবেন। আমাকেই কোনদিন দেখতে দেন নাই।"

কয়েকদিন থাকার পর, ব্রাহ্মণ মেয়েটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন বিশ্ববসু বললেন, "মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে ঠিকই কথা। কিন্তু আমার তো কোন অর্থ সঞ্চয় নেই। আমি কিছু দিতে পারবো না।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার একটা শর্ত আছে। আমি একবার নীলমাধবকে দর্শন করবো।" শুনে বিশ্ববসু অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলেন, বললেন "বিয়েটিয়ে সব আপনার ভাঁওতাবাজী। আপনি আমার নীলমাধবকে চুরি করতে এসেছেন। আপনি এখান থেকে এখনি চলে যান।" শেষে মেয়ের অনুরোধে, তার কান্নাকাটিতে, নীলমাধবকে দেখাতে রাজী হন "তবে চোখে সাতপুরু কানি বেঁধে দিতে হবে।" ব্রাহ্মণ তাতেই রাজী হন। চোখ বাঁধা অবস্থায় যখন যান, একটা ন্যাকড়ায় সরষে ভরে, ছিটিয়ে দিয়ে ফেলতে ফেলতে যান।

শবর কন্যার বিবাহ ও ইন্দ্রদ্যুম্নকে সংবাদ প্রেরণ

তারপর শবর কন্যাকে বিয়ে করে, সেখানে বেশ কিছুদিন থাকেন। আস্তে-আস্তে সেই সরষে ফেলার পথ ধরে তিনি একদিন নীলমাধবের কাছে পৌছে যান। তারপর তিনি একদিন উধাও হয়ে যান। সমস্ত খবর তিনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সরবরাহ করেন। তারপর একদিন শোনা যায় নীলমাধব চুরি হয়ে গেছে।

"বিশ্ববসু দুঃখে কাতর হয়ে নীলমাধব! নীলমাধব! বলতে বলতে, পাগল হয়ে দেহত্যাগ করেন।" পুরীতে নীলমাধব জগন্নাথ নাম ধারণ করেন। তিনি একদিন, রাজাকে স্বপ্ন দেন, "যে বিশ্ববসু 'নীলমাধব' রূপে আমার সেবা পূজা করতেন, তাঁর বংশধরেরা 'দয়িত' সেবক নামে যুগ যুগ আমার সেবা করবে।

আমার 'অর্চক' হবে বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভজাত পুত্ররা। আর ভোগ রান্নার কাজ করবেন বিদ্যাপতি ও শবরীর গর্ভজাত সন্তানরা। তাঁরা 'সুয়ার' (সুপকার) নামে খ্যাত হবে।

রাজা বলেন, "প্রভু! যে বৃদ্ধ কারিগর, আপনার মূর্তি প্রকট করেছেন, তাঁর বংশধরেরা যেন যুগে যুগে জীবিত থাকেন এবং আপনার রথ নির্মাণ করেন।"

তিনি আরও বলেন, "আপনার শ্রীমন্দির প্রতিদিন একপ্রহর অর্থাৎ তিন ঘন্টা বন্ধ থাকবে, আর সাধারণের জন্যে সব সময় খোলা থাকবে।"

শ্রীজগন্নাথ, তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং তাঁর নিজের জন্য একটি বর চাইতে বলেন। রাজা তখন বলেন, "হে প্রভু! আমার বংশে কোনও ব্যক্তি যাতে আপনার শ্রীমন্দিরকে নিজ সম্পত্তি বলে দাবী না করতে পারে, তার জন্যে আমি নির্বংশ হতে চাই।"

Scanned with OKEN Scanner

"তাই হবে!" বলে জগন্নাথ বর দান করেন। তখন থেকেই স্নান যাত্রা, অনবসর কালে অর্থাৎ জ্বরের সময় ওষুধ-পাঁচন দিয়ে সেবা এবং রথযাত্রা, 'দয়িতরাই' অর্থাৎ শবরীর গর্ভজাত সন্তানরা এবং 'পত্তিরা' অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানরা পুজো করে আসছেন।

ধর্মীয় পীঠস্থান

ভগবান বিষ্ণু দেশের চারটি পীঠস্থানকে, দৈনন্দিন কাজকর্মের জায়গা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এক রামেশ্বরে তিনি স্নান করেন। দুই, বদ্রিনাথে তিনি ধ্যান করেন। তিন, পুরীতে তিনি আহার করেন এবং চার, দ্বারকায় তিনি বিশ্রাম করেন।

হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ সাতটি তীর্থের মধ্যে পুরী পরম পবিত্র। এখানে ভগবান কৃষ্ণ, সদা শান্তরূপে অবস্থান করেন। পুরীর অন্যান্য কিছু নামও আছে। যেমন—শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল, নীলগিরি, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, মর্ত্য বৈকুণ্ঠ, জগন্নাথ ধাম, জগন্নাথ পুরী ইত্যাদি।

তার মধ্যে পুরী নামটি বিশেষ প্রচলিত। এখানে দাদা বলভদ্র, ছোট বোন সুভদ্রা ও জগন্নাথ, শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে রত্নসিংহাসনে অবস্থান করে আছেন।

শ্রীক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হলো রথযাত্রা। তার আগে স্নানযাত্রা ও অনবসর কাল (১১১২ সালে গঙ্গ বংশীয় সম্রাট চোর গঙ্গ পুরাতন মন্দিরের ওপর, বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মতান্তরে অনঙ্গ ভীমদেব বর্তমান মন্দিরের নির্মাতা। ১২৩০ সালে নির্মাণ কার্য শেষ হয়। রাজা অনঙ্গ ভীমদেব অত্যন্ত ভক্তিমান ও ধর্মপ্রবণ ছিলেন। তিনি বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে সারা জীবন ধরে মন্দিরের সুরক্ষা, সেবা, পূজা করে গেছেন সেজন্যে তাঁকে দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন বলা হয়।

স্নান যাত্রা

সাধারণতঃ প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে, জগন্নাথের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ব্রহ্মা স্বয়ং, একশোটা সোনার কলসী থেকে গঙ্গাজল দিয়ে জগন্নাথের স্নান করিয়েছিলেন। বর্তমানে, অনার্য পদ্ধতিতে, কোনদিন সূর্যালোক স্পর্শ করে নাই, এরকম কূপের জলে স্নান করানো হয়। দারুমূর্তিগুলিকে টেনে, হিঁচড়ে, স্নান মণ্ডপে আনা হয়। এদের সঙ্গে থাকে, কাষ্ঠ নির্মিত সুদর্শন চক্রের প্রতীক স্বরূপ সুদর্শন। একবার কর্ণাটকের যুবরাজ, স্নানযাত্রা দেখতে আসছিলেন। পথে যে কোন কারণে দেরী হয়ে যায়। তিনি যখন পৌছান তখন স্নান যাত্রা শেষ হয়ে গেছে, পোষাক পরানো হচ্ছে। তিনি ছিলেন গণেশের ভক্ত। তিনি মনে-মনে ভাবলেন "আমি হাতীর পোষাক পরানো দেখবো। সঙ্গে-সঙ্গে পাণ্ডাদের স্বপ্নাদেশ হলো হাতীর পোষাক পরানোর। তখন থেকেই হাতীর পোষাক পরানো হয় জগন্নাথকে।

তারপরেই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জ্বর হয়। পাণ্ডারা ওনাদের গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারেন ওনাদের গা গরম হয়েছে। তখন বদ্যি ডাকা হয়। ওষুধ-পাঁচনের ব্যবস্থা করা হয়। তখন ওনারা মন্দিরের মধ্যে গুপ্ত থাকেন। ঐ সময়টিতে পনেরো দিন জগন্নাথের দ্বার বন্ধ থাকে। ঐ সময়টিকে জগন্নাথের 'অনবসর কাল' বলে। ঐ সময় একমাত্র শবর-দয়িতরা দেবদর্শন করতে পারেন। তখন তাঁরা, নানাভাবে জগন্নাথের সেবা করেন।

পুরীর রথ তৈরি

বসন্ত পঞ্চমী অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দিন থেকে, রথ তৈরির জন্যে নানান জায়গা থেকে কাঠ আসতে শুরু হয়।। অক্ষয় তৃতীয়া অর্থাৎ চন্দন যাত্রার (২১ দিন ব্যাপী) দিন থেকে রথ তৈরি শুরু হয়।

Scanned with OKEN Scanner

তিনটি রথ তৈরি করার জন্যে, ঐ দিন থেকে জগন্নাথের আজ্ঞামালা নিয়ে এসে, পাণ্ডারা কাঠগুলো পুজো যজ্ঞাদি করে থাকেন।

মাসীর বাড়ি

রথযাত্রার আগের দিন 'অনবসর কাল' শেষ হয়। ভগবান জ্বর থেকে মুক্ত হন। তারপর রাজবৈদ্যের অনুমতি নিয়ে তিন ভাই-বোন রথে চেপে, মাসির-হাতের 'পোড়া-পিঠে' খেতে যান। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে, ছাপান্ন ভোগ দিয়ে, ভোজন সেরে, রথে ওঠেন। তখন তাঁদের চন্দন, কর্পূর মাখিয়ে, পট্টবস্ত্র পরিয়ে, ফুলের মুকুট ইত্যাদি নানান সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করা হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে রত্ন সিংহাসন থেকে নেমে রথের দিকে এগিয়ে যান।

ঐ সময় দারু মূর্তিগুলি রেশমের দড়ি দিয়ে বেঁধে সিংহদ্বার দিয়ে বের করা হয়। তুলো লাগানো একটা কাঠের বেদী থেকে, আর একটা কাঠের বেদীর উপর রেখে, খানিকটা শূন্যে তুলে, দোলা দিয়ে রথে চাপানো হয়। সিংহদ্বার থেকে রথে চাপানো পর্যন্ত ঘটনাকে 'পহতি বিজয়' বলা হয়। পুরো দায়িত্ব থাকে 'দয়িতাপতি' সেবকদের উপর। তারপর ওনাদের ব্যবহারের জিনিসপত্র, গয়নার বাক্স, তোলা হয় রথে। চতুর্দিকে পাণ্ডা-ঠাকুররা, কোমর দুলিয়ে কাঁসর, ঘন্টা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকেন। তারপর গজপতি মহারাজ এসে, রথে পুজো দেন এবং সোনার ঝাঁটা দিয়ে পথ মার্জনা করে যান। চারিদিকে বিপুল নাম সঙ্কীর্তন আরম্ভ হয়।

পুরীর রথের বর্ণনা

মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমীর দিন থেকে অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দিন হইতে রথ তৈরির জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হয়। এই কাঠ দশপল্লা জেলার রণপুর জঙ্গল হইতে নিয়ে আসা হয়। রাণপুরের রাজা প্রথমে উক্ত কাষ্ঠ প্রদান করিতেন, পরে তাঁহাদের জামাতৃসূত্রে ঐ স্বত্ব লইয়া দশপল্লার রাজা অদ্যাবধি উহা যোগাইয়া আসিতেছিলেন। বর্তমানে গড়জাত রাজ্য উড়িষ্যার অর্ন্তগত হওয়ায় উড়িষ্যা সরকার রথের কাষ্ঠ যোগাইতেছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ধামের এই শ্রীরথযাত্রা উৎসব হলো সর্বপ্রধান। ইহার অপর নাম হইল—'নবযাত্রা', 'গুণ্ডিচাযাত্রা, 'নন্দিঘোষ যাত্রা', 'পতিতপাবন যাত্রা' বা 'মহাবেদী উৎসব'। মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীজগন্নাথদেব বলেছিলেন— "আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রার সহিত আমাকে ও শ্রীবলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া নবযাত্রা উৎসব সম্পন্ন করিবে। যেস্থানে আমি আবির্ভূত হই এবং যেস্থানে তোমার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাবেদী বর্তমান, সেই শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে আমাকে লইয়া যাইবে।"

প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়া হইতে নূতন রথের নির্মাণ কার্য শুরু হয়। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার জন্য পৃথক পৃথক তিনখানি রথ তৈরি করা হইয়া থাকে।

শ্রীজগন্নাথদেবের জন্য যে রথ প্রস্তুত করা হইল, সেই রথের নাম 'নন্দিঘোষ'। এই রথের চূড়ায় চক্র ও শ্রীগরুড় অবস্থিত। এইজন্য এই রথকে 'চক্রধ্বজ' বা 'গরুড়ধ্বজ' রথও বলা হয়ে থাকে। এই রথটি উচ্চতায় ২৩ হাত এবং ইহাতে ৫ হাত পরিধিবিশিষ্ট অষ্টাদশ-সিদ্ধির প্রতীক স্বরূপ ১৮টি চাকা থাকে (মতান্তরে ১৬টি)।

Scanned with OKEN Scanner

শ্রীবলদেবের জন্য যে রথটি নির্মাণ হয় সেই রথটির শীর্ষভাগে 'তালচিহ্ন' আছে, সেইজন্য ইহার নাম হয় 'তালধ্বজ', ইহাকে 'হলধ্বজও' বলা হয়ে থাকে। এই রথটি উচ্চতায় ২২ হাত এবং উহাতে সাড় চার হাত পরিধি বিশিষ্ট ষোড়শ কলার প্রতীক স্বরূপ ১৬টি চাকা (মতান্তরে ১৪টি) থাকে।

শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথের নাম 'পদ্মধ্বজ' বা 'দেবদলন'। এই রথটি উচ্চতায় ২১ হাত। ইহাতে ৪ হাত পরিধিবিশিষ্ট (চৌদ্দ ভুবনের প্রতীক স্বরূপ) ১৪টি (মতান্তরে ১২টি) চাকা থাকে।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথ হয় পীতবর্ণের।

শ্রীবলভদ্রের রথ হয় নীলবর্ণের।

শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথ কৃষ্ণবর্ণের হয়।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথের রক্ষক হলেন—শ্রীনৃসিংহ। সারথী হলেন—মাতলি, অশ্বচতুষ্টয় হলো—রেচিকা, মোচিকা, সুক্ষ্মা ও অমৃতা। ইহাদের বর্ণ হয়—শুক্ল।

শ্রীবলদেবের রথের রক্ষক হলেন—শেষাবতার। সারথির নাম—সুদ্যুম্ন। অশ্বচতুষ্টয়ের নাম—স্থিরা, ধৃতি, স্থিতি ও সিদ্ধা। ইহাদের বর্ণ—কৃষ্ণ।

শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথের রক্ষক হলেন—বনদুর্গা, সারথি হলো—অর্জুন। অশ্বচতুষ্টয়ের নাম হলো—অধর্ম, অজ্ঞান, অপরাজিতা ও জ্যোতিনী।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথের পার্শ্বদেবতা হলেন—দক্ষিণে বরাহ, গোবর্ধনকৃষ্ণ ও গোপীকৃষ্ণ। পশ্চাতে নৃসিংহ, রাম ও নারায়ণ। বামে ত্রিবিক্রম, হনুমান ও রুদ্র।

শ্রীবলভদ্রের রথের পার্শ্বদেবতা হলেন—দক্ষিণে গণেশ, কার্তিকেয় ও সর্বমঙ্গলা পশ্চাতে প্রলম্বঘ্ন, হলায়ুধ ও মৃত্যুঞ্জয়। বামে নটাম্বর, মহেশ্বর ও শেষদেব।

শ্রীসুভদ্রার রথের দক্ষিণে চণ্ডী, চামুণ্ডা ও উগ্রতারা। পশ্চাতে বনদুর্গা, শূলী দুর্গা, ও বারাহী। বামে শ্যামাকালী, মঙ্গলা ও বিমলা।

ইহা ছাড়া শ্রীজগন্নাথদেবের রথের দ্বারদেশে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা এবং ঋষিপাটায় মরীচিপ্রমুখ সপ্তর্ষি থাকেন।

শ্রীবলদেবের রথের দ্বারদেশে রুদ্র ও সাত্যকি এবং ঋষিপাটায় অষ্টবসু।

শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথের দ্বারদেশে শ্রীদেবী ও ভূদেবী এবং ঋষিপাটায় অষ্টভৈরব থাকেন।

রথযাত্রা

রথ ধীরে ধীরে চলতে থাকে। রথগুলি বলগুণ্ডিতে পৌছালে, সেখানে বলগুণ্ডি ভোগ হয়। তারপর সন্ধ্যার সময় রথ 'গুণ্ডিচা মন্দিরে' পৌছে যায়। রথেই রাত কাটান। চলতে থাকে ভোগ রাগ। পরের দিন সন্ধ্যার সময় 'পহণ্ডি বিজয়'-এর মাধ্যমে 'নাকোচনা' দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেন গুণ্ডিচা মণ্ডপের যজ্ঞ বেদীতে। চতুর্থ দিন 'হেরা পঞ্চমীতে' লক্ষ্মী দেবী আসেন জগন্নাথকে দর্শন করার জন্যে।

লক্ষ্মীদেবীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শ্রীজগন্নাথদেবকে গোপিনীদের হাত থেকে রক্ষা করা। লক্ষ্মীদেবী মনে করেন, বছরে একবার করে মাসীর বাড়ি যাওয়া মানেই, গোপিনীদের মনোরঞ্জন করতে যাওয়া। তিনি তিনদিন একা-একা, স্বামী চিন্তায় বিভোর ছিলেন। আর থাকতে না পেরে, চার দিনের দিন বৃন্দাবনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রকে সঙ্গে করে গুণ্ডিচা মন্দিরে হাজির হন। গোপিনীদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করার জন্যে, তিনি গরম 'সরষে পোড়ার দাওয়াই' ছুঁড়ে জগন্নাথকে বশীভূত করতে চান। কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায়, সেই রাত্রেই তিনি ফিরে যান। ওণ্ডি পাড়ার এই উৎসবের নাম 'পোড়া-উৎসব' বা 'বিজয় উৎসব'।

Scanned with OKEN Scanner

চার দিন পর নবমী তিথিতে তিনি আবার ওতিচা অভিমুখে যাত্রা করেন। এবারেও বৃন্দাবনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রকে সঙ্গে করে আনেন। বাড়তি কেবল 'শালগ্রাম-লীলা', লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে, স্বয়ং বিষ্ণু আসবেন শুনে, মাসীর বাড়িতে বিরাট খাবারের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। লক্ষ্মীদেবী এবার ফন্দি আঁটেন, সমস্ত খাবার গোয়ালাদের দ্বারা লুট করে নেবেন। তখন প্রেম-ভালোবাসা সব ছুটে যাবে। খাবার লুট হয়ে যাবার পর জগন্নাথ সিদ্ধান্ত নিলেন, "থাক পরকীয়া প্রেম, আগে পেটপুজো।" পরের দিনই তিনি রথ নিয়ে শ্রীমন্দিরে ফিরলেন। একেই 'উল্টোরথ' বা 'বাহুড়া যাত্রা' বলে।

সপ্তম দিবসে সন্ধ্যার পরে একটি উৎসব হয় তার নাম 'সন্ধ্যাদর্শন'।

অষ্টম দিবসে লক্ষ্মী 'লুট-পাটকে' বলা হয় 'জগবন্ধুর ভোগের হাঁড়ি লুট'।

অষ্টম দিবসে অর্থাৎ নবমী তিথিতে রথ তিনটিকে সুসজ্জিত করে, দক্ষিণ মুখে ঘুরিয়ে রাখা হয়। নবম দিবসে অর্থাৎ দশমী তিথিতে, রথের দিনের মত সমস্ত নিয়ম মেনে, বলভদ্র, সুভদ্রা, জগন্নাথ ও সুদর্শনকে রথে তোলা হয়। আরম্ভ হয় পূর্ণযাত্রা।

তারপর একাদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়, রাজবেশ, 'রাজাধিরাজ বেশ' বা 'শুনা বেশ'। শাস্ত্রেতে এই 'শুনা বেশ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "রথে বামনং দৃষ্ট্বা, পুনর্জন্ম নঃ লভতে।" অর্থাৎ রথে যে বামনরূপ দর্শন করবে, তার আর পুনর্জন্ম হয় না, এর প্রকৃত অর্থ হলো আমাদের দেহ হলো রথ। সেই রথের সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ 'আত্মা' বর্তমান। যার এই আত্মাপলব্ধি হয়, তিনি মুক্ত হয়ে যান।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রাজাধিরাজ বেশ পরানো হয়—শ্রীহস্ত অর্থাৎ সোনার হাত, শ্রীপায়ার অর্থাৎ সোনার পা, শ্রীমুকুট অর্থাৎ সোনার মুকুট, শ্রীময়ূর চন্দ্রিকা অর্থাৎ সোনার ময়ূর পালক, শ্রীচুলাপাটি অর্থাৎ সোনার চুল, শ্রীকুণ্ডল অর্থাৎ সোনার দুল, শ্রীরহু রেখা অর্থাৎ গালে

সোনার অলংকার, শ্রীমালা অর্থাৎ সোনার তৈরি হার, যেমন—পদ্মমালা, চম্পামালা, কান্তিমালা, সেবতিমালা ইত্যাদি। শ্রীচিহ্ন অর্থাৎ তিনটি বিগ্রহের তিনটি সোনার নেত্র বা নানা মূল্যবান পাথর খচিত।

এখানে দেখা যায়, জগন্নাথের ডান হাতে সোনার সুদর্শন চক্র, বাম হাতে শঙ্খ।

বলভদ্রের ডান হাতে সোনার গদা ও বাম হাতে সোনার লাঙ্গল।

এর পরের দিনে হয় 'অধরপানা ভোগ'। তাতে চার পাঁচ ফুট উচ্চতায় তিনটি করে মোট নয়টি মাটির হাঁড়িতে লস্যি ভোগ প্রস্তুত করা হয়। তারপরে ঐ সমস্ত হাঁড়িগুলোকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়। কথিত আছে যে, রথের নীচে অনেক অতৃপ্ত আত্মা থাকে, তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যেই ঐ হাঁড়িগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়।

এইবার শ্রীজগন্নাথ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করবেন। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর আদেশে সিংহদ্বার বন্ধ। তখন লক্ষ্মীদেবীর দেব দাসীরা এবং দয়িতাপতিদের সঙ্গে বচসা আরম্ভ হয়। তাতে জগন্নাথদেব পরাজিত হন। অবশেষে লক্ষ্মীদেবীর রাগ ভাঙ্গানোর জন্য তাঁকে রসগোল্লা খাওয়ান। সিংহদ্বার খোলা হয় এবং দেবত্রয় পুনর্রায় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন।

জগন্নাথদেবের ভোগ রান্নার রন্ধনশালা

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হোটেল হলো জগন্নাথদেবের রন্ধনশালা। সাধারণতঃ সমস্ত ভোগকেই প্রসাদ বলা হয়। কিন্তু একমাত্র পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রে তা হয়ে উঠেছে 'মহাপ্রসাদ'। সকালে প্রথমে জগন্নাথদেবের যে প্রথম ভোগ হয় তার নাম হয় 'গোপাল বল্লভ ভোগ'। তারপর ভাত, পিঠে ডালসহ যে ১৩ রকমের ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ, তাকে বলে 'ধূপ' বা 'পঞ্চ উপাচার'। এছাড়া মধ্যাহ্নে ধূপ, সন্ধ্যা ধূপ, রাত্রে পান্তা ভাতের ভোগ হয়ে থাকে।

Scanned with OKEN Scanner

জগন্নাথদেবের রন্ধনশালাতেই একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকের রান্না করা সম্ভব। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই রন্ধনশালাতে কোনরূপ পিতল, কাঁসার ব্যবহার করা হয় না। শুধু মাটির ভাঁড়। তেল-মশলার কোন ব্যাপার নেই, পুরোটাই সিদ্ধ। কোন গ্যাসের ব্যাপার নেই, জ্বালানি বলতে বনের কাঠ। প্রতিদিন কয়েক হাজার টাকার হাঁড়ি, কলসী লাগে। জগন্নাথের অতি প্রিয় হলো নারিকেল। প্রতিদিন শুধু নারিকেল আসে এক মিনি ট্রাক ভর্তি করে। জলে চাল ভিজিয়ে, কাঠের চুল্লীতে বসিয়ে দিলেই অন্নভোগ তৈরি হয়ে যাবে। সবজি কেটে থরে থরে, সাজিয়ে মাটির কলসীর মধ্যে রেখে, পরিমাণ মত জল দিয়ে কাঠের চুল্লীতে বসিয়ে দিলেই সবজি তৈরি। এখানকার মহাপ্রসাদকে বলা হয় 'অন্নব্রহ্ম'। রান্নার পর তা জগন্নাথদেবকে নিবেদন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখন তা মহাপ্রসাদে রূপান্তরিত হয় না। তারপর সেটা নিবেদন করা হয় দেবী বিমলাকে। তারপর সেটা হয়ে ওঠে মহাপ্রসাদ। সেখানে, ঠাকুরের এক অদ্ভুত মহিমা লক্ষ্য করা যায়। কোথা থেকে এক সুগন্ধ এসে ঐ মহাপ্রসাদের সঙ্গে মিশে যায়। ওখানকার সমস্ত হিন্দু পরিবারে, প্রায় সব অনুষ্ঠানেই আগে মহাপ্রসাদ গ্রহণ, তারপরে অন্য সব প্রথা চালু আছে। ছাপান্ন ভোগ দিয়ে ঠাকুরের অন্নভোগ দেওয়া হয়।

ছাপান্ন ভোগ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ছাপান্ন ভোগ সম্বন্ধে যা জানতে পারা যায় তাহা হইল যে, জগন্নাথদেবের 'ছাপান্ন ভোগ' নামে রাজদত্ত মিষ্টদ্রব্য ভোগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ছাপান্ন প্রকার মিষ্ট দ্রব্যের তালিকা ছাড়াইয়াও অনেক সময় ভোগের আরও প্রকার দেখা যায়। স্থানীয় কোন কোন পাণ্ডাও বলেন—'ছাপান্ন ভোগ' বলতে বহুরকম মিষ্ট দ্রব্যের ভোগকে বুঝায়। জগন্নাথ মন্দির হইতে এই ছাপান্ন ভোগের তালিকা সম্বন্ধে জানতে পারা যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

(১) চন্দ্রকান্তি, (২) সরকুম্পা, (৩) পারিজাতক, (৪) গজা, (৫) সানপুরি, (৬) সরভাজা, (৭) আরিষা, (৮) ছানাপিঠা, (৯) পিঠাপুলি, (১০) জেনামণি, (১১) রাধাবল্লভী, (১২) অমৃত-রসাবলী, (১৩) জগন্নাথ বল্লভ, (১৪) লক্ষ্মীবিলাস, (১৫) গজা, (১৬) সাতপুরী, (১৭) নারিকেল লাড্ডু, (১৮) ছানা মাখুয়, (১৯) বল্লভকোরা, (২০) খিরিষা, (২১) সান-নাড়ী, (২২) মালপোয়া, (২৩) বলি-বামন, (২৪) লেবতি ঝিলি, (২৫) কাকতুয়াঝিলি, (২৬) বড়া, (২৭) বড়-খিরিষা, (২৮) সরকাকরা, (২৯) খোয়ামণ্ডা, (৩০) ধনুশ্বরণ, (৩১) সরমণ্ডা, (৩২) পোড়পিঠা, (৩৩) নড়িয়াখুদি, (৩৪) চাউতাপুরী, (৩৫) বড়-নাড়ী, (৩৬) নুনফেণী, (৩৭) ফেণামণ্ডা, (৩৮) চুলিয়া চুপড়া, (৩৯) পাগ-আরিষা, (৪০) খলিকটি, (৪১) গুড়খিরিষা, (৪২) সানঝিলি, (৪৩) খরিকামরা, (৪৪) সুয়ারী, (৪৫) মোহনভোগ, (৪৬) চাড়েই-নদা, ৪৭) অমালু, (৪৮) পনশুয়া, (৪৯) চিতউপিঠা, (৫০) বুঁদিয়া খিরি, ৫১) সরুচকুলি, (৫২) হংসকেলি, (৫৩) মাখুয়, (৫৪) সরপণা, ৫৫) হংসবল্লভ, (৫৬) সরপাপুড়ি, (৫৭) মেন্টাশিঙ্গিয়া, (৫৮) মতরহমণ্ডা, (৫৯) নিমকি, (৬০) গঁইঠা পিঠা, (৬১) খণ্ডমণ্ডা, (৬২) গড়স্বা, (৬৩) বড়ঝিলি, (৬৪) কাণিকা, (৬৫) ছানাচকটা, (৬৬) ীহন্তকোরা, (৬৭) ডালিম্ব (দন্তভাঙ্গা), (৬৮) সর, (৬৯) অরখকুল, ৭০) বড়-পুরি, (৭১) নুণ খুরমা, (৭২) মরিচ-লাড্ডু, (৭৩) কর্ণলপুলি, ৭৪) মাখন, (৭৫) শেউ, (৭৬) খইরচুর, (৭৭) এণ্ডুরী, (৭৮) মাঠপুলি, ৭৯) অটকালি, (৮০) মহাদেঙ্গ, (৮১) তিপুরী, (৮২) ফেণা, (৮৩) চড়া, (৮৪) মগজনাড়ু, (৮৫) সরমণ্ডা।

রন্ধনশালায় ঢুকেই দেখা যাবে, ডানদিকে একটু উঁচু চাতালের মত জায়গায় বহু লোক নারকোল কোরার কাজ করছে, আর একটা ক বহুজন মিলে ডাঁই করা সবজি থেকে সবজি কাটতে ব্যস্ত। ওখান কে আবার ডানদিকে ঘুরলে দেখা যাবে সেই রহস্যময় বিশাল

রান্নার হল ঘরখানি। ওখানে একমাত্র রাঁধুনী আর পূজারী ছাড়া আর কারও ঢোকার অধিকার নেই। এদের প্রত্যেকের মুখে কাপড় বাঁধা অবস্থায় থাকে। অপর কেউ এদের ছুঁতে পারবে না। ঐ রান্নাঘরের দেওয়াল কেটে কেটে কিছুটা অন্তর-অন্তর ঘুলঘুলির মত করা আছে। ঐগুলো দিয়ে কাঠ প্রবেশ করানো হয়। বাইরে থেকে সবাই ঐ ফাঁক দিয়েই রন্ধনশালা দর্শন করে থাকেন। কতকগুলো ঘুলঘুলিতে আবার চোঙের মত লাগানো আছে। ঐগুলো দিয়ে ভিতরে জল পাঠানো হয়।

ঐ সমস্ত রান্নার জল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে ১০০ ফুট গভীর দুটি কূপ থেকে। এই জল খেতে এতই সুস্বাদু , যে খেলেই হজম হয়ে যায়। রান্নাঘর থেকে ভোগ মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার সময় ঐ পথে ঘোরা-ফেরা করা চলবে না। তার জন্য গেট বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রন্ধনশালায় তিন ধরণের চুল্লী আছে। একটি ভাত, একটি সবজি আর একটি পিঠের জন্য। এক একটি চুল্লী চারফুট বাই আড়াই ফুট। গভীরতায় দুই ফুট। চুল্লীর সংখ্যা হলো আড়াইশো। রাঁধুনীর সংখ্যা খুব কম করে হলেও প্রায় ছয়শো। তাদের রান্নার সরঞ্জাম যোগান দেওয়ার জন্য চারশো লোক আছে।

হাঁড়ির উপর নয়টা করে হাঁড়ি বসিয়ে রান্না করা হয়। সবজি ভর্তি কলসীগুলির মুখে ঠেসে ঠেসে নারকেল কুরা ভরে দেওয়া হয়। ওর থেকে তেল বেরিয়ে খাবারের সঙ্গে মিশে যায়। আলু, তেল, নুন একেবারেই দেওয়া হয় না। ইদানিং খাবারের স্বাদের জন্য সামান্য নুন দেওয়া হয়। চাল প্রতিদিন ৩০ থেকে ৭০ কুইন্টাল লাগে। উৎসবের সব পরিমাণটা বেড়ে ১০০ কুইন্টালে পৌঁছে যায়।

এখন ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করে ঠাকুরের পিঠে তৈরি হয়। মন্দিরের উত্তর পূর্ব কোণে, ভোগ বিক্রীর 'আনন্দ বাজার' বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'ওপেন এয়ার'। "রাত্রে পান্তা ভাতের ভোগ হয়।"

Scanned with OKEN Scanner

আনন্দ বাজার

শ্রীমন্দিরের উত্তরপূর্বদিকে মহাপ্রসাদ বিপণি বা 'আনন্দ বাজার' অবস্থিত। এইখানে জগন্নাথদেবের বিভিন্ন প্রকার ভোগের অন্নমহাপ্রসাদ, ছাপান্নভোগের মিষ্টপ্রসাদাদি বিক্রয় হয়। বাজারের বেষ্টনীর মধ্যে। রাজভোগের প্রসাদ- বিক্রয়ের জন্য রাজার একটি দোকান আছে। প্রত্যেক প্রসাদের মূল্য নির্ধারিত আছে। আনন্দ বাজারে উচ্ছিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট পাত্রের কোন বিচার নেই। একই উচ্ছিষ্ট পাত্রে শত শত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

মহাপ্রসাদ সেবনের বিধি

• মহাপ্রসাদ ভক্তি সহকারে সেবন করার বিধি। সেবনে যেন কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠাভাব না থাকে।

• মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবার সময় কোন আসনের উপর বসা অনুচিত।

• মহাপ্রসাদ নির্মল মনে গ্রহণ করতে হয়। সেবন করবার সময় যেন কোন আত্ম-অহমিকা প্রকাশ না পায়।

• সকলের মাঝে একস্থানে বসে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। প্রসাদ গ্রহণের সময় উচ্চনিচ কোন ভেদাভেদ যেন মনের মধ্যে না থাকে।

• যে কোন সময় শৌচাশৌচ বিচার না করে গ্রহণ করা যায়

• মহাপ্রসাদ বাসি হোক বা শুকনো হোক যেরূপই হউক না বা দূর দেশ থেকে আনয়ন করেও সেবন করা যায়।

• মহাপ্রসাদ ফেলে রাখা অনুচিত। মহাপ্রসাদ পাওয়া মাত্রই সেবন করা উচিত। এক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্র, বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়।

• মহাপ্রসাদের সাথে রান্না করা খাবার খাওয়া উচিত নয়।

Scanned with OKEN Scanner

● মহাপ্রসাদ সেবনের পূর্বে "বলভদ্র সুভদ্রায় জগন্নাথায়তে নমঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণ করা উচিত।

পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে চূড়ায় ধ্বজা খোলা

পুরীর মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা খোলা খুবই আশ্চর্যজনক একটা দেখবার বিষয়। বহুজনই ধ্বজা খোলা ও ধ্বজা লাগানোর দৃশ্য দেখার জন্য ঠিক নির্দিষ্ট সময় বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকেন। একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন ধ্বজা কখন খোলা হবে, বলতে পারেন? কিন্তু কেউই কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। ধীরে ধীরে দেখা যায় একজন একজন করে প্রায় হাজার হাজার লোক সেখানে জমায়েত হয়ে গেলো। তখন মনে হলো, 'এইবার বুঝি ধ্বজা খুলবে'! ঠিক যখন ঘড়ির কাঁটায় ছয়টা বাজলো, তখন দুটো তোপধ্বনি হলো। সঙ্গে সঙ্গে একজন মূল মন্দিরের সামনে যে মন্দির তার ওপর উঠে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো। ঐ লোকটির কোমরে একটি লাল পতাকা বাঁধা। লোকটি প্রথমে কোন্ দিক দিয়ে উঠলো, দেখতে পাওয়া গেল না। লোকটি ক্রমশঃ মূল মন্দিরে চেপে ওপরে চূড়ার দিকে এগোতে লাগলো। ধীরে ধীরে লোকটি মন্দিরের চূড়ার কাছে পৌঁছে গেল। শেষের কিছুটা অংশ মোটা লোহার চেন ধরে উঠে গেল। অত উঁচুতে লোকটাকে নীচ থেকে খুব ছোট দেখাচ্ছিল।

প্রথমে লোকটি শেখানো পদ্ধতি অনুসারে ওপরে পৌঁছে ধ্বজাটি খুলল এবং গলায় জড়িয়ে নিলো। তারপর কোমরের বাঁধা কাপড়টি খুলে নিয়ে, পূর্বের মত নতুনটা পরিয়ে দিল। নতুন পতাকাটি পত্ পত্ করে উড়তে লাগলো। এইরূপ দৃশ্য দেখে নীচে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যান।

এইবার পুরানো পতাকাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে লোকটি নামতে লাগলো। এখানে লোকটার সাহস প্রশংসনীয়। ভর সন্ধ্যাবেলায় অতটা ওপরে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। যদি কোন কারণে পা ফস্‌কে যায় তাহলে নীচে পড়ে গিয়ে ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। এমনকি জীবনহানিরও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীজগন্নাথদেবের এমনই কৃপা যে, লোকটি ওপরের কাজ সমাধা করে ঠিক যথাযথভাবে নীচে নামতে থাকে। লোকটি নিশ্চয়ই জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত এবং নিরহংকারী। যেদিন ওই লোকটির মনে অহংকার আসবে "আমি ছাড়া আর কেউ একাজ করতে পারবে না, সেদিনই ওর পতন ঘটবে।"

নীচে নেমে এসে লোকটা কোমরে বাঁধা পূর্বের পতাকাটি ফিতের মত কেটে কেটে অর্থের বিনিময়ে ভক্ত জনগণের নিকট বিক্রয় করিত।

এই কাপড়ের টুকরো ক্রয় করিবার জন্যে ভক্ত জনগণের মধ্যে মারামারি, হুড়াহুড়ি পড়ে যেত। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এইরূপ পতাকা বিক্রি হয়ে চলেছে। এতটুকু চাহিদা কমে নাই। এই টুকরো কাপড়ে নিশ্চয়ই জগন্নাথদেবের বিশেষ কিছু মাহাত্ম্য আছে। নিশ্চয়ই কোন উপকার হয়—তা না হলে ওই কাপড়ের জন্য সকলের এত উৎসাহ উদ্দীপনা কেন? তবে এখানে পুরো ইচ্ছা শক্তিই কাজ করে। এই পতাকার টুকরো মাথায় বেঁধে বা মাদুলীতে ভরে মনে করে, 'জগন্নাথ' আমার সঙ্গেই আছেন। আমার কোন অমঙ্গল হতে পারে না। এটাই হলো ইচ্ছা শক্তি।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, লোকটি পতাকা খোলা থেকে নামান পর্যন্ত প্রায় আধঘণ্টা বা তার অধিক কিছু সময় লাগে। ওই সময়টুকু নীচে জমায়েত হাজার-হাজার নরনারী ভক্তগণ একদৃষ্টে ঐ দৃশ্য দেখতে থাকে, তাদের চোখের পলক পর্যন্ত পড়ে না। সকলের

Scanned with OKEN Scanner

মনে রাখা উচিত এটাই হলো একাগ্রতা, সাধনার বিশেষ অঙ্গ। যা মুনি ঋষিদের কত সাধ-সাধনা করে আনতে হয়।

"ধন্য তিনি, ধন্য সেই মনীষী, যিনি ধ্বজা বাঁধাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করেছেন সাধনার শ্রেষ্ঠ সোপান 'একাগ্রতা'।

পুরীর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা ঠুঁটো অর্থাৎ বিকলাঙ্গ কেন?

পুরীতে জগন্নাথদেবের যে মন্দির সেই মন্দিরের ভিতরে যে তিনটি মূর্তি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। এই তিনটি মূর্তি তৈরি করেছেন স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।

বিশ্বকর্মা হলেন এই বিশ্বের যিনি নিয়ন্তা অর্থাৎ এই বিশ্বকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি আর কেউ নন স্বয়ং পরমাত্মা। গোটা ব্রহ্মটা তার মধ্যে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ তিনটি পৃথক সত্ত্বা।

কথিত আছে "সমুদ্রের জলে ঠিক 'বারো' বছর অন্তর তিনটি নিমকাঠ ভেসে আসে।" তার অর্থ কি?

এখানে আমরা সমুদ্র বলতে যা বুঝি এ সে সমুদ্র নয়। এ হচ্ছে ব্রহ্ম সমুদ্র। যে জীবের আসা-যাওয়া সংঘটিত হয়। এতে জলের কোন বালাই নেই। তাহলে নিশ্চয়ই নিম কাঠও কোন কাঠ নয়। সেটা অবশ্যই বার-বার, 'নিম-নিম' উচ্চারণ করলে মণি হয়ে যাবে। অর্থাৎ এই নি কাঠের উৎপত্তি হলো, মনের মণি কোঠায়।" তিনটি কাঠ কি কি তিনটি কাঠ হলো, দেহ, জীবাত্মা আর পরমাত্মা। দেহ, দেহী ও দেহাতীত। আমরা যাঁদের সুভদ্রা, বলরাম ও কৃষ্ণ বলে চিনি, লক্ষ্য করলে দেখ যায়, বাম পাশে কৃষ্ণ, আর ডান পাশে বলরাম, মাঝখানে সুভদ্রা। দুই পাশে দুই পুরুষ, মাঝখানে প্রকৃতি। একপাশে পরমাত্মা, আর একপাশে

জীবাত্মা, মাঝখানে দেহ। অর্থাৎ দেহের মধ্যে জীবাত্মা, বাইরে পরমাত্মা, মাঝখানে দেহ।

জীবাত্মা আর পরমাত্মা সর্বদাই পাশাপাশি আছেন। দেহই ওনাদের পৃথক করে রেখেছেন। দেহ চলে গেলেই, ওনাদের মিলনের কোন অসুবিধা নাই।

প্রতিটি জীব ও জড়ের মধ্যে অখণ্ড পরমাত্মা অণুপ্রবিষ্ট। সেটাই হলো আত্মা। জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করলেও পরমাত্মা যেখানকার সেইখানেই থেকে যান। দেহ পুড়িয়ে দিলেও পরমাত্মার কোনরূপ স্থানচ্যুতি ঘটে না।

পরমাত্মা বিভু চৈতন্য। জীবাত্মা অণু চৈতন্য। ঋক্‌বেদে বর্ণিত আছে যে, "সমস্ত জীবজগৎ হলো একভাগ আর ব্রহ্ম হলেন নিজে তিনভাগ।" অর্থাৎ পরমাত্মা বৃহৎ, জীবাত্মা ক্ষুদ্র। পরমাত্মা পূর্ণ জীবাত্মা খণ্ড।"

তা সত্ত্বেও বলরামকে, শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলা হয় কেন?

এখানে বোঝার বিষয় হলো, "ব্রহ্ম বা পরমাত্মা যত বড়ই হন না কেন, তিনি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু জীবাত্মা ছোটই হোন না কেন তিনি ক্রিয়াশীল। জীবের মধ্যে তিনি অবস্থান করেন, জীব চেতনা পায় এবং ভাল মন্দ দু-রকম কাজ করতে সক্ষম হয়।

জীব কত কল-কারখানা, গান, সাহিত্য, কাব্য, কবিতা সৃষ্টি করেছে। নিত্য নূতন-নূতন সৃষ্টি করে পৃথিবীকে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা করে তুলেছে।

অন্য গ্রহ বা উপগ্রহে যেখানে কোন জীবন নাই, যেখানে কোন বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় না, সেগুলো মরুভূমি বলে প্রতিভাত হয়। অথচ যেখানে ব্রহ্ম বর্তমান।

আমরা এখানে আবাদ করি, বিবাদ করি, সুবাদ করি। এখানকার বৈচিত্রতা এত বেশী, যা ভাবে ভাষায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

Scanned with OKEN Scanner

কিন্তু ব্রহ্মের কোন মধুরতা প্রকাশিত হয় না। তাই বলরামকে শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলা হয়। (বলরাম কিন্তু একটা জীবাত্মা নন, এই বিশ্বে যত জীব বর্তমান, তাঁদের যত জীবাত্মা আছেন, তাঁদের সমষ্টি)

কিন্তু সমুদ্রে যে 'বারো' বছর অন্তর কাঠ ভেসে আসার কারণটি কি?

রামায়ণে রামের বনবাস কৈকেয়ী সারাজীবন চাইলেই পারতেন। কিন্তু চৌদ্দ বছর যাওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আবার মহাভারতে পাণ্ডবদের 'বারো' বছর বনবাস এক বছর অজ্ঞাতবাস কেন? অর্থাৎ পিতা ও সন্তানের বয়সের পার্থক্য অবশ্যই তের থেকে চৌদ্দ বছর হবে। কারণ বাবার শরীরে শুক্রাণু আর মায়ের শরীরে ডিম্বাণু পরিপুষ্ট হতে 'বারো' থেকে 'চৌদ্দ' বছর সময় লাগে। একেই সাধারণতঃ বনবাস বলা হয়ে থাকে।"

আবার সন্তান জন্মাবার পর প্রায় একবছর, মায়ের গর্ভে থাকতে হয়। এ গর্ভবাসকেই অজ্ঞাতবাস বলা হয়।

মনোবিজ্ঞানও ঠিক একই কথা বলছে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ চৌদ্দবছর। ঐ সময়টাকে ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঐ সময় মা-বাবাকে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হয়, নইলে সন্তানের পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী।

আবার শরীর বিজ্ঞানে বলছে, "মানবের বুদ্ধাঙ্ক চৌদ্দ বছর 'উপর দিকে' বাড়ে। তারপর আর 'উপর দিকে' বাড়ে না, আশেপাশে বৃদ্ধি পায়।

তাই সন্তান রূপ জগন্নাথকে পৃথিবীতে আসতে হলে, মা বাবার শরীরে কমপক্ষে 'বারো' বছর থাকতে হয়। একেই তির্যক-জরায়ুজ জীবের বনবাস বলে।

তাই 'বারো' বছর অন্তর জগন্নাথের কাঠ ভেসে আসার কথা বলা হয়েছে।

মূর্তি যখন তৈরি হয়ে যাবে, তখন জগন্নাথের দরজা আপনা-আপনি খুলে যাবার মানে কি?

জন্মগ্রহণের পর, সন্তান পরিপুষ্টি হতে, কমপক্ষে 'ন' মাস দশদিন সময় লাগে। তারপর মাতৃদ্বার আপনা-আপনি খুলে যায়। মাঝখানে কেউ যদি দ্বার খোলার চেষ্টা করে অর্থাৎ অসময়ে প্রসব করায়। সন্তান বিকলাঙ্গ হয়। সেইজন্যই অসময়ে দ্বার খোলার জন্যই কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা আজ বিকলাঙ্গ হয়েই অবস্থান করছেন।

ভক্তের ভগবান জগন্নাথ

জগন্নাথের কাছে কোন জাতি ধর্মের বিচার নাই। উনি হচ্ছেন ভক্তের ভগবান। ভক্ত যে জাতির হোক না কেন—উচ্চ নীচ ধনী নির্ধনী সকলের কাছেই তিনি ভগবান। ভক্ত যে আশা নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান তিনি সব সময়ই তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেন। তিনি শুধু ওই রত্নসিংহাসনেই বসে থাকেন না, তিনি ভক্তগণের কল্যাণের জন্য ভক্তদের সঙ্গে মিশে যান। ভক্তগণ তাঁর দর্শনে ধন্য করেন তাঁদের জীবন।

ইনি হলেন ভক্তের ভগবান। ভক্ত তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করেন তিনি তা পূরণ করেন। যেমন সংসারে শান্তি, বিদ্যালাভের উন্নতি, অর্থলাভ, চাকুরিতে পদোন্নতি, মামলায় জয়লাভ, চরম বিপদ থেকে উদ্ধার, রোগ মুক্তি, সন্তানপ্রাপ্তি, সর্বপ্রকার সৌভাগ্য প্রভৃতি সব হিতকর কামনাই তিনি পূর্ণ করেন।

Scanned with OKEN Scanner

মহাপ্রভু জগন্নাথের দ্বাদশ যাত্রা

মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের বারোমাসে অর্থাৎ দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটি (বারোটি) যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যথা—(১) বৈশাখমাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় চন্দনযাত্রা। (২) জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা, (৩) আষাঢ়মাসে রথযাত্রা, হেরা পঞ্চমী ও গুণ্ডিচা উৎসব, (৪) শ্রাবণ মাসে ঝুলন যাত্রা, (৫) ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও কালীয় দমন, (৬) আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয় বিজয় উৎসব, (৭) কার্তিক মাসে রাস উৎসব। (৮) অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথমাষ্টমী উৎসব, (৯) পৌষ মাসে পৌষপূর্ণিমায় বিগ্রহদের অভিষেক উৎসব, (১০) মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে শীত বস্ত্র উন্মোচন, (১১) ফাল্গুনমাসে অনুষ্ঠিত হয় দোলযাত্রা উৎসব। (১২) চৈত্র মাসে দমন কার্পনোৎসব।

মহাপ্রভু জগন্নাথের চোখের কোন পাতা নেই। সেজন্য তিনি নিদ্রাহীন, সদাসর্বদাই তিনি জাগ্রত থাকেন। তিনি নিদ্রাহীনভাবে জগৎসংসারের সব কিছুই দেখছেন। তাঁর হাত না থাকলেও তিনি সবকিছু গ্রহণ করে রয়েছেন। তিনি দূরগামী হলেও তাঁর কোনও পা নেই। চোখ না থাকলেও তিনি সবকিছুই দেখতে পান। কান নেই অথচ তিনি সব কিছুই শুনতে পান। তিনি সব কিছুই জানেন। তাই ব্রহ্মবিদ্‌দের কাছে তিনি মহান আর আদি পুরুষ।

শ্রীজগন্নাথ দর্শন করলে পাপক্ষয় ও পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তিনি ভক্তকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গফল দান করেন। সর্বতীর্থের ফল লাভ হয়ে থাকে জগন্নাথদেব দর্শনে।

মহাপ্রভু জগন্নাথের সাজ-পোশাক

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মহাপ্রভুকে সপ্তাহের সাতদিন সাতরঙের পোশাক পরানো হয়। প্রত্যেক দিনের তিনি নক্ষত্র বিচার করে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে সপ্তাহে সাতদিন সাত রঙের কাপড় পরানো হয়। তার সঙ্গে অলঙ্কার, ফুলের সাজ ইত্যাদি দিয়ে সাজসজ্জা করান হয়ে তাকে।

কোন্ দিন কোন্ রংয়ের পোশাক পরানো হয় নিচে উল্লেখ করা হলো—

রবিবার—লাল জবা ফুলের রংয়ের পোশাক অথবা লাল রংয়ের।

সোমবার—সাদা রংয়ের পোশাক মাঝে কালো কালো ওটি সহ।

মঙ্গলবার—ঘোর রক্তবর্ণের পোশাক। তবে অন্য রংয়ের মিশ্রণ থাকে।

বুধবার—সবুজ বা নীল রং।

বৃহস্পতিবার—পীতবর্ণ চাঁপা ফুলের রং।

শুক্রবার—সাদা রংয়ের পোশাক।

শনিবার—কালো রংয়ের কাপড় পরানো হয়।

জগন্নাথ মহাপ্রভু আর একাদশী

শ্রীক্ষেত্রে একাদশী পালনের নিয়ম নেই। কিন্তু কেন।—এর পিছনে একটি বহুল প্রচলিত উপাখ্যান আছে। ব্রাহ্মণকন্যা বাল্য বিধবা সাত্তা রথারূঢ় দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ দেবকে বহু কষ্টের পর দর্শন করলেন। তাঁর বহুদিনের আশাপূরণে অন্তরে আনন্দ স্রোত বইছে, চোখে ঝরছে প্রেমাশ্রু।

তিনি আজও শ্রীধামে রয়েছেন। রথযাত্রার পরদিন একাদশী। নিষ্ঠার সঙ্গে শান্ত নিরম্বু একাদশী পালন করেন। কিন্তু সেদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অতি

Scanned with OKEN Scanner

কাতর; প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত। তাঁর এই অবস্থা অন্তর্যামী শ্রীজগন্নাথ বুঝতে পেরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কাছে এলেন। বললেন, 'মা, তুমি এখানে এই অবস্থায় কষ্ট সহ্য না করে কিছু খাদ্য গ্রহণ কর। এভাবে জগন্নাথ দর্শনের ফল নষ্ট করছ কেন?'

ব্রাহ্মণী শান্ত গলায় বললেন, 'আমি একাদশী ব্রত পালন করছি সাধ্যানুসারে। জগন্নাথ দর্শনের ফল নষ্ট করব কেন!'

ব্রাহ্মণরূপী জগন্নাথ বললেন, 'শ্রীক্ষেত্রে উপবাস পালন করে তুমি তোমার পুণ্যফল নষ্ট করছ।'

ব্রাহ্মণী তাঁর একথায় অত্যন্ত রেগে গিয়ে অনেক কঠিন কথা শুনিয়ে বললেন, 'তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে একথা আমায় বলছ কী করে? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তুমি ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্ক।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'মা তুমি সন্তানকে ক্ষমা কর। আমাকে একাদশী ব্রতপালন আর রথারূঢ় জগন্নাথ দর্শনের ফল দয়া করে বল।'

ব্রাহ্মণী কিছুটা নরম হয়ে বললেন, 'একাদশী ব্রত পালনে শ্রীহরির সান্নিধ্য, কৃপা আর চরণ লাভ হয়। সব পাপ থেকে মুক্ত হয়। আর রথে জগন্নাথ দর্শনের ফলে পুনর্জন্ম আর হয় না, জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশে যায়।'

ভক্তের ভগবান জগন্নাথদেব ভক্তের মানভঞ্জনের জন্য একবার নিজ মূর্তি ধারণ করে ব্রাহ্মণীকে পরম স্নেহে বললেন, পূর্বে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আর আজ তোমাকে আমি শ্রীক্ষেত্রে একাদশী ব্রত পালনে বারণ করছি। আমাকে দর্শন মাত্র এখানে সব পাপ নষ্ট হয়। কিন্তু এখানে আগের কোনও ব্রত পালনে সব পুণ্য নষ্ট হয়। আমার মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা, পাপ তোমায় স্পর্শ করবে না।'

ব্রাহ্মণ আরও বললেন, 'আমার শ্রীমন্দিরের নীচে একাদশী দেবীর মূর্তি আছে। দেবী একাদশীকে দর্শন আর প্রণাম করলে আমার ঘরে সে একাদশীর পূর্ণ ফল লাভ করবে।'

[সাপ্তাহিক বর্তমান হইতে সংগৃহীত (১৭ জুন ২০২৩)]

পুরীতে দর্শনীয় কিছু স্থান

(১) কোণারকের সূর্য মন্দির

পুরী থেকে ২৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই সূর্যদেবের মন্দিরটি এখন একটি ধ্বংসাবশেষ। এই মন্দিরটি কালো পাথর দ্বারা নির্মিত এক অসাধারণ ভাস্কর্য। ঐতিহাসিকদের মতে এই সূর্যদেবের মন্দিরটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা নরসিংহদেব (দ্বিতীয়) নির্মাণ করেছিলেন।

মন্দিরটি একটি বিরাট রথের আকারে নির্মিত। এই রথটিতে ২৪টি চাকা আছে। প্রতি চাকায় ৮টি করে খাড়ি আছে। ২৪টি চাকা ২৪ ঘন্টা এবং ৮টি খাড়ি ৮টি প্রহরকে নির্দেশ করে থাকে। চাকাগুলির ব্যাস ৯.৯ ফুট। এই ২২৭ ফুট উচ্চ সূর্যদেবের মন্দিরটি দেখলে মনে হয় সূর্যদেব যেন সাতটি ঘোড়ায় চড়ে উদিত হচ্ছেন। তবে মূল মন্দিরটি এখন আর নেই সেটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যে অংশটুকু আছে তার উচ্চতা ১২৯ ফুট ৪ ইঞ্চি। এছাড়াও ছিল একটি নৃত্য মণ্ডপ ও ভোগ মণ্ডপ। সম্মুখে ছিল গজসিংহ প্রস্তর মূর্তি। পাশে একটি নবগ্রহের মূর্তিও ছিল। সমগ্র মন্দির অঞ্চল জুড়ে প্রায় ১৪ শত পূর্ণাবয়ব হাতির মূর্তি ছিল।

কোণারকের এই সূর্যমন্দিরে তিন রকমের সূর্যদেবতা আছেন। দক্ষিণ দিকের সূর্যদেবতাকে বলা হয় 'উদিত সূর্য'। এর উচ্চতা ৮.৩ ফুট। পশ্চিমদিকের সূর্যদেবতাকে বলা হয় 'মধ্যাহ্নসূর্য'। এটির উচ্চতা হলো ৯.৬ ফুট। আর উত্তরদিকের সূর্যদেবতাকে বলা হয়ে থাকে 'অস্ত সূর্য'। এর উচ্চতা হলো ১১.৫ ফুট।

Scanned with OKEN Scanner

এই সূর্য মন্দিরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অভিনব বিষয় হলো রথের চাকা। এই রথের চাকার অসাধারণ ভাস্কর্য দেখে সকলেই মুগ্ধ হন।

(২) উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড় ভুবনেশ্বর শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। উদয়গিরি পাহাড়ের উচ্চতা ১১০ ফুট এবং এখানে ১৪টি গুম্ফা আছে। আর খণ্ডগিরি পাহাড়ের উচ্চতা হলো ১৩৩ ফুট এবং এখানে ১৯টি গুম্ফা আছে। এই গুম্ফাগুলির বিভিন্ন নাম আছে, যেমন—অনন্ত গুম্ফা, হাতী গুম্ফা, বৈকুণ্ঠ গুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা ইত্যাদি। আনুমানিক ২ হাজার বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এই গুম্ফাগুলি। প্রাতঃ কালে সূর্যদেবের দেখার প্রথা ছিল এই উদয়গিরি থেকে। সেজন্য এই পাহাড়টির নাম হয়েছে উদয়গিরি।

ধবলগিরি—পুরী হইতে ভুবনেশ্বর যাওয়ার পথেই ১০ কিলোমিটার গেলেই ধবলগিরি পাহাড়। সম্রাট অশোকের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে এই ধবলগিরি পাহাড়ের চূড়াতে।

(৩) গুণ্ডিচা মন্দির

জগন্নাথ দেবের মন্দির থেকে আনুমানিক ৩ কিলোমিটার দূরে বড়দাণ্ডর শেষপ্রান্তে গুণ্ডিচা মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাণী গুণ্ডিচার নামানুসারে এই মন্দিরের নাম রেখেছিলেন গুণ্ডিচা মন্দির। ঐতিহাসিকদের মতে এই গুণ্ডিচা মন্দিরেই নাকি জগন্নাথ, সুভদ্রাদেবী এবং ভগবান বলভদ্রের বিগ্রহ তৈরি করা হয়েছিল। কারণ তখনও বড় মন্দির তৈরি হয়নি। পরবর্তীকালে জগন্নাথদেবের মন্দির

নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ওই মন্দিরে বিগ্রহগুলিকে প্রতিষ্ঠা করেন। পুরীতে যত মন্দির আছে তার মধ্যে জগন্নাথদেবের মন্দিরের পর গুণ্ডিচা মন্দিরের নাম করা যায়। তার কারণ এই মন্দিরেই রথযাত্রার দিন জগন্নাথ, সুভদ্রাদেবী ও বলভদ্র সারাদিন অবস্থান করেন। অনেকের ধারণা এই যে, রথের দিন জগন্নাথদেব সপরিবারে গুণ্ডিচা মন্দিরে তাঁর মাসির বাড়ি যান। কিন্তু গুণ্ডিচা তাদের মাসির বাড়ির পথ। জগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ি হলো বরদাণ্ডের উপর অবস্থিত অর্ধাসানী দেবীর মন্দির।

প্রায় সাত একর জায়গার উপর এই মন্দির প্রাঙ্গণটি নির্মিত। বিমান, জগমোহন, নাটমণ্ডপ এবং ভোগমণ্ডপ নিয়ে গঠিত মূল মন্দিরটি খুব বড় নয়।

রথযাত্রার দিন জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলভদ্র শ্রীমন্দির হতে বের হয়ে এই গুণ্ডিচা মন্দিরে আসেন। তাঁরা প্রধান দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে রত্নবেদীতে অবস্থান করেন কিন্তু বের হন দ্বিতীয় দ্বার দিয়েই।

(৪) সাক্ষীগোপাল

পুরী থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তরে সাক্ষীগোপাল এই ছোট শহরটি অবস্থিত। কথিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে ভক্ত দামোদরের হয়ে সাক্ষী দেওয়ার জন্য এখানে এসেছিলেন। এই স্থানটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভালো লেগে যাওয়ায় এখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। সেই থেকেই এই স্থানটির নাম সাক্ষীগোপাল গুপ্ত বৃন্দাবন। এখানে মন্দিরের ভিতরে সাক্ষীগোপালের এক অপূর্ব সুন্দর মূর্তি আছে। মন্দিরের উত্তরে শ্রীরাধাকুণ্ড এবং দক্ষিণে শ্রীশ্যামকুণ্ড আছে। এবং নিকটেই অবস্থিত চন্দনপুকুর। কার্তিক মাসের নবমীতে শ্রীরাধার পদ দর্শন হয়। সেই সময় এখানে খুবই জাঁকজমকপূর্ণ এক বড় উৎসব পালিত হয়ে থাকে।

Scanned with OKEN Scanner

(৫) চিল্কা হ্রদ

বঙ্গোপসাগরের উত্তর পশ্চিমে পুরী হইতে ১৫০ কিলোমিটার দূরে এই চিল্কা হ্রদ অবস্থিত। এটি ভারতের বৃহত্তম লবণ জলের হ্রদ। এই হ্রদটি দৈর্ঘ্যে ৭২ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ১৬ কিলোমিটার। চিল্কা হ্রদে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। জেলেরা প্রত্যহই এই হ্রদ থেকে মাছ ধরে। এই মাছ বিদেশে পর্যন্ত রপ্তানি করা হয়।

হ্রদটির দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ছোট ছোট উঁচু পাহাড় অবস্থিত। চতুর্দিকে গাছপালা ও হ্রদের জলের সমন্বয়ে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। হ্রদের জলে ডলফিনও দেখা যায়।

(৬) ভুবনেশ্বর

এই শহরটি সকল পর্যটকদের কাছেই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ভুবনেশ্বর উড়িষ্যার রাজধানী। শোনা যায় এখানে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেছিলেন। শিশুপাল গড় নামে এখানে একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। ভুবনেশ্বর নগরের, মাহাত্ম্য 'কপিল সংহিতায়' এবং 'ব্রহ্মপুরাণ'-এ বর্ণনা করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন করে একটি সুবিন্যস্ত প্রাচীন নগরীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। সারা ভুবনের শহর জুড়ে অসংখ্য মন্দির অবস্থিত। সেজন্য ভুবনেশ্বরকে মন্দিরের শহর বলা হয়। বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দির ভুবনেশ্বরে অবস্থিত।

(৭) নন্দন কানন

পুরীতে অবস্থিত এই নন্দন কানন ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ চিড়িয়াখানা। পুরী থেকে ৮৫ কিলোমিটার দূরে এই চিড়িয়াখানাটি অবস্থিত। এখানের

সাদা বাঘ পৃথিবী বিখ্যাত। এছাড়াও এখানে সিংহ সাফারীও খুবই রোমাঞ্চকর। ৫০ একর জায়গার মধ্যে প্রায় ১০টি সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(৮) লিঙ্গরাজ মন্দির

ভুবনেশ্বরে অবস্থিত লিঙ্গরাজ মন্দিরটি ১১০০ শতাব্দীতে সোমবংশীয় রাজা ললাটেন্দু কেশরী নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটি উচ্চতায় ১৮০ ফুট। এখানে ভগবান শিবের লিঙ্গ বিগ্রহ আছে। লিঙ্গ বিগ্রহটি স্ফটিক শ্রীবাস এবং উজ্জ্বল নীলবর্ণের মন্দিরের শিল্পকর্মে সকলকে মুগ্ধ করে।

ভুবনেশ্বরের অন্যান্য মন্দির

মন্দিরের শহর ভুবনেশ্বরে বিখ্যাত লোকনাথ মন্দির ছাড়াও আরও বহু মন্দির আছে। যেমন— মার্কণ্ডেয়েশ্বর মন্দির, কপিলেশ্বর মন্দির, শিশিরেশ্বর মন্দির, মুক্তেশ্বর বা রাজারাণী মন্দির, পর-পুরাণেশ্বর মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভুবনেশ্বরে বিন্দু সরোবর নামে এক বৃহৎ সরোবর আছে। অনেকের বিশ্বাস এই সরোবরে স্নান করলে পুণ্য অর্জন হয়। সরোবরের চারিধারেই মন্দির আছে। এখান থেকে ১ কিলোমিটার দূরে কেদারগৌরী কুণ্ড নামে একটি অন্তঃসলিলা প্রস্রবণ আছে। এই প্রস্রবণের জল অত্যন্ত নির্মল। স্বাস্থ্যপ্রদ ও উদররোগের মহৌষধ।

Scanned with OKEN Scanner

পুরীতে অবস্থিত কিছু মঠ ও মন্দির

(১) শঙ্করানন্দ মঠ

এই মঠটি বালিসাহীতে অবস্থিত। শ্রীধর গোস্বামী এখানে বাস করতেন। এই মঠটি পরিচালনা করেন অদ্বৈত পন্থীরা।

(২) রামানুজ কোট মঠ

এই বিশাল মঠটি ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সাড়ে চার কাঠা জমিতে স্বর্গদ্বার রোডের উপর অবস্থিত। এটি পুরীর অন্যতম প্রাচীন মঠ। এই মঠটি পুরীর ভক্তদের নিকট অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। এই মঠে বেণুগোপাল এবং রামানুজের পূজা করা হয়। আচার্য রামানুজ একবার নাকি এই মঠে এসেছিলেন।

(৩) মঙ্গু মঠ

জগন্নাথ মন্দিরের পূর্বদিকে সিংহদ্বারের সামনে এই মঠটি অবস্থিত। উদাসীন সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই মঠের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। এই মঠে গুরুনানকের পুত্র শ্রীচান্দজীর আসন পাতা আছে।

(৪) পুরুষোত্তম মঠ

১৯৫৩ সালে ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ এক একর জমির উপর এই মঠটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠে কালো পাথরের কৃষ্ণ মূর্তি ও সাদা শ্বেত পাথরের রাধা রয়েছেন। রথযাত্রার সময় এই মঠে বিরাট উৎসব

হয়। এখানে চৈতন্যদেবেরও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে মূর্তিটি নিম কাঠ দিয়ে তৈরি। রথযাত্রার উৎসবের সময় এখানে বহু মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। এই মঠে আর একটি প্রধান উৎসব হলো ঝুলন যাত্রা। তবে এই ঝুলনযাত্রা পুরীর অধিকাংশ মঠেই বিশেষ মর্যাদায় পালিত হয়ে থাকে।

প্রত্যহ ভোর চারটের সময় ঠাকুরের মঙ্গল আরতি হয়। দুপুর বারোটা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে। তারপর মন্দির বন্ধ থাকে। পুনরায় চারটে থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে। প্রতিদিন পাঁচবার ঠাকুরের ভোগ হয়।

(৫) রাধাবল্লভ মঠ

জগন্নাথ মন্দিরের পূর্ব দিকে সিংহ দ্বারের সামনে এই মঠটিও অবস্থিত। এই মঠে রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে মুখ্য দেবতা হিসাবে পূজা করা হয়। স্বয়ং নিম্বকাচার্য এই মঠটি স্থাপন করেন।

(৬) গোবর্ধন মঠ

এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শঙ্করাচার্য। গোবর্ধন মঠে অর্ধনারীশ্বর শিবমূর্তি, শ্বেতপাথরের তৈরি শঙ্করাচার্যের প্রতিমূর্তি আছে। ইহা ছাড়াও ব্রহ্মা, বৈষ্ণবী, কৃষ্ণ, ইন্দ্রাণী, বরাহী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি আছে।

(৭) জগন্নাথ বল্লভ মঠ

এই মঠটি বিষ্ণুস্বামী প্রতিষ্ঠিত। এখানে জগন্নাথদেব পূজিত হন। রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের মন্ত্রী রামানন্দ এই মঠেই তাঁর সাধনা

Scanned with OKEN Scanner

করেছিলেন। এই মঠে জগন্নাথদেবের দীপাবলী, দমনক পর্ব, রামলীলা ইত্যাদি নানান উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে চতুর্ভুজ গোপাল ও হনুমানজীর পূজা হয়ে থাকে।

(৮) সিদ্ধ বকুল মঠ

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশে যবন হরিদাস পুরীতে এসে অবস্থিত বকুল গাছের তলায় বসেই ভজনা করতেন। এই গাছটিই সিদ্ধ বকুল নামে প্রসিদ্ধ। এই গাছটিকে নিয়ে লোকশ্রুতি আছে এই যে, একবার রথযাত্রার আগে রথের একটি চাকা হঠাৎ ভেঙে যায়। তৎক্ষণাৎ রথের চাকা নির্মাণের জন্য উপযুক্ত কাঠের খোঁজে সকলে বেরিয়ে পড়েন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজন এসে এই বকুল গাছটির কথা বলেন। এই বিরাট আকৃতির গাছটি থেকেই রথের চাকা নির্মাণের উপযোগী কাঠ পাওয়া সম্ভব। রাজা সিদ্ধান্ত নেন যে এই পবিত্র গাছের কাঠ দিয়েই রথের চাকা নির্মাণ করবেন। পরের দিন ভোরবেলা রাজা যখন লোকজন নিয়ে গাছটি কাটতে আসেন, তখন দেখেন সেখানে কোন গাছ নেই। সেই স্থানে পড়ে আছে একটি বাকল।

(৯) শ্রীলোকনাথ মন্দির

শ্রীলোকনাথ মন্দিরই পুরীর প্রাচীনতম মঠ এবং অত্যন্ত জাগ্রত দেবস্থান। এই মন্দিরটি পুরীর একেবারে প্রান্ত সীমায় অবস্থিত। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে শিবলিঙ্গ সবসময় পাতালে জলমগ্ন অবস্থায় থাকে। শিবরাত্রিতে এই শিবলিঙ্গকে জলের তলা থেকে জাগ্রত করা হয়। এই সময় এখানে

বিরাট মেলা উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। ভক্তদের নিকট এই স্থানটি প্রধান দর্শনীয় স্থান।

(১০) শ্রীবাসুদেব আশ্রম

নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলার ১৩৪৩ সালে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শ্রীগোবিন্দজীর মূর্তি আছে। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির পাশে রয়েছে শ্রীশ্রীবাসুদেব রামানুজ দাশের মূর্তি।

(১১) বাটো কালী মন্দির

এই বাটো কালী মন্দিরটি স্বর্গদ্বার রোডের উপরই অবস্থিত। বহু পূর্বে এক বটগাছের তলায় বাটো কালী পূজা অনুষ্ঠিত হত। সাধক ওঁঙ্কারনাথ এই স্থানেই বাটো কালীর পূজা করেন। এখানের মূর্তিটিতে কালী মায়ের পদতলে শিব শয়িত অবস্থায় আছেন।

কালীপূজা ছাড়াও এখানে মা দুর্গা এবং মা জগদ্ধাত্রীর পূজা অতি ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার সময় মা কালীর নানা বেশ হয়। রাজরাজেশ্বরী বেশ, শ্যামাকালীর বেশ, প্রভৃতি নানারকম বেশে মাকে সাজানো হয়।

(১২) নীলাচল আশ্রম

শ্রীসীতারাম দাস ওঁঙ্কারনাথ প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমটি গোবর্ধন মঠের উত্তরদিকে অবস্থিত। এখানে ওঁঙ্কারনাথজীর গুরু শ্রীদাশরথী দেবের তৈলচিত্র পূজিত হয়। এই মঠে অখণ্ড নাম যজ্ঞ করা হয়। বহু পুণ্যার্থী এই আশ্রম দর্শনে এখানে আসেন।

Scanned with OKEN Scanner

স্বর্গদ্বার মহাশ্মশান

এই শ্মশানটি বহু প্রাচীন। স্বর্গদ্বার রোডের উপর বেলাভূমির ঠিক বিপরীতে এই মহাশ্মশান অবস্থিত। অনেকের মনেই বিশ্বাস, যদি এই শ্মশানে কোন মৃতব্যক্তিকে দাহ করা হয়ে থাকে তবে সে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এই মহাশ্মশান এক পুণ্যভূমি। যেজন্য অনেক দূরদুরান্ত থেকে অনেকেই মৃতদেহ এই স্থানেই দাহ করিবার জন্য নিয়ে আসেন।

এই অঞ্চলটি পর্যটকদের ভীড়ে সব সময়ই জমজমাট হয়ে থাকে। শ্মশানের একদিকে সমুদ্র এবং অপর দিকে বাজার অঞ্চল। এই স্থানটি দর্শনের জন্য বহুজনই এখানে আসেন।

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে অবস্থিত কিছু মন্দির ও স্নান

(১) কল্পবট

এই বটগাছটি বহুকাল যাবৎ মন্দিরের ভিতর প্রাঙ্গণে রোহিণীকুণ্ডের তীরে অবস্থিত। এই বটগাছটি 'কল্পবট' নামে পরিচিত। এই বৃক্ষটিকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন—অক্ষয়বট, বরুণবট, বংশীবট ইত্যাদি। এই বটগাছের বিবরণ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভক্তিমান ভক্তরা যদি একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়ে এই 'বটকল্পের' নিকট প্রার্থনা করে থাকেন তবে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। অনেকে আবার মনোস্কামনা পূরণের জন্য 'কল্পবটের ডালে' সুতো বেঁধে রেখে মানত করেন। ভগবান বিষ্ণুর আবাসস্থল হলো এই 'কল্পবট'। প্রতি যুগ শেষে ভগবান বিষ্ণু এই 'কল্পবটের' পাতায় নিদ্রা যান। কল্পবটের

মূলে পাথর দিয়ে বেশ সুন্দর সৌন্দর্যপূর্ণ উঁচু বেদী তৈরি হয়েছে। চারিধারে যাওয়ার জন্য রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে।

ব্রহ্মা এই বৃক্ষটির সৃষ্টি কর্তা। কার্তিক মাসের ত্রয়োদশ পূর্ণিমা তিথিতে কল্পবটের জন্মদিন।

(২) বটকৃষ্ণ

কল্পবট বৃক্ষের নীচে একটি ছোট মন্দির আছে। সেই মন্দিরে বটকৃষ্ণ বা নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বটকৃষ্ণের মূর্তিটি কষ্টি পাথর দিয়ে তৈরি। নারায়ণ এখানে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হাতে চতুর্ভুজ। ডিম্বাকৃতি এক পাথরকুণ্ডের ভিতর ইনি শয়ন করে আছেন। ইনি হলেন বনমালী এবং 'পাপ ক্ষয়কারী'।

(৩) বাল মুকুন্দ

কল্পবটের পূর্বদিকে একটি ছোট মন্দির আছে। সেই মন্দিরের ভিতরে বটবৃক্ষের পাতায় শুয়ে আছেন বালক কৃষ্ণ। দক্ষিণ মুখে তার মাথা। স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে—মহাপ্রলয়ের সময় যখন বালক কৃষ্ণ বটবৃক্ষের পাতায় শুয়েছিলেন সেই সময় প্রলয়ের জলে ভেসে যাওয়া ঋষি মার্কণ্ডেয়কে ডেকে তাঁর নিকট আশ্রয় দিয়েছিলেন।

(৪) বট গণেশ

বট গণেশের মন্দিরটি কল্পবট গাছের নীচেই অবস্থিত। গণেশের মূর্তিটি চার ফুট উঁচু পাথর দিয়ে নির্মিত। গণেশের সামনে আছে কালো পাথরে তৈরি একটি ছোট ইঁদুর। গণেশের মূল প্রসাদ হলো লাড্ডু আর নারকেল। বট গণেশকে বটগণেশ ছাড়াও আরও ভিন্ন ভিন্ন

Scanned with OKEN Scanner

নামে ডাকা হয়। যেমন—সিদ্ধিবিনায়ক, কল্প-গণপতি, কল্পগণেশ, চিন্তামণি গণেশ, সিদ্ধাগণেশ ইত্যাদি। ভক্তিভরে গণেশের পূজা করলে সব বাধা-বিঘ্ন দূর হয়, মানুষ সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। এইজন্যই একে সিদ্ধি বিনায়ক বলা হয়।

(৫) কোইলি বৈকুণ্ঠ

কোইলি বৈকুণ্ঠ নামটির বিষয় নানান মতবাদ আছে, কেউ কেউ মনে করেন দক্ষিণ ভারতে কোইলি কথার অর্থ মন্দির। বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর ধাম। কেউ বা বলেন কোইলি মানে জীবাত্মা বৈকুণ্ঠে পরমাত্মার সাথে মিলিত হন।

এই মন্দিরটি পুরীর মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে মেঘনাদ প্রাচীর এবং কূর্ম প্রাচীর-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কথিত আছে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে কোকিল রূপে দেখা দিয়েছিলেন সেই জন্য এই স্থানের নাম কোইলি বৈকুণ্ঠ। এই স্থানকে নির্বাণ ভূমিও বলা হয়। এই স্থানকে অতি পবিত্র স্থান হিসাবে মনে করা হয়। এখানে শ্মশান চণ্ডীও আছেন। এছাড়া লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ আছে।

(৬) অগ্নিশ্বর মহাদেব

সূর্যদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে ২২টি সিঁড়ি অতিক্রম করে ভিতর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে বাঁ দিকে 'অগ্নিশ্বর মহাদেবের' ছোট মন্দিরটি অবস্থিত। রন্ধনশালা থেকে ভোগমণ্ডপ যে পথে চলে গিয়েছে তার অগ্নিকোণেই মন্দিরটি অবস্থিত। ইনি হলেন মন্দিরের রন্ধনশালার অগ্নির রক্ষক। এটা বিশ্বাস যে ভগবান অগ্নিশ্বর মহাদেবের আশীর্বাদে অর্দ্ধ সিদ্ধ মহাপ্রসাদ যখন এই পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তা সম্পূর্ণ রান্না

হয়ে যায়। এই অগ্নিশ্বর মহাদেবকে দর্শন করলে সব পাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়।

(৭) সত্যনারায়ণ মন্দির

সত্যনারায়ণ হলো বিষ্ণুর রূপ। মূর্তিটি উচ্চতায় ৫ ফুট কষ্টি পাথরে নির্মিত। এই মন্দিরটি কূর্মবেড়ার দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত। মূর্তিটির কারুকার্য অতি শোভনীয়। সত্যনারায়ণের চার হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ও দুই পাশে আছেন জয়া ও বিজয়া। নতজানু হয়ে আছেন গরুড়। সত্যনারায়ণ হলেন হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই দেবতা। এই দেবতার সবচেয়ে প্রিয় প্রসাদ হল সিন্নি। ভক্তগণ তাঁদের সন্তানের জন্মদিনে মঙ্গলকামনায় সত্যনারায়ণ পূজা করে থাকেন। মুসলমানেরা এই দেবতাকে সত্যপীর নামে পূজা করেন। মুঘল যুগে বার বার মুসলিম আক্রমণের সময় এই সত্যনারায়ণ মন্দিরের অভ্যন্তরে হিন্দু ও মুসলমান যৌথ দেবতারূপে সত্যনারায়ণকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

(৮) কৃষ্ণ মন্দির

সত্যনারায়ণ মন্দিরের পশ্চিমদিকে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির অবস্থিত। এখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ পূজিত হন। মন্দিরটি উত্তরমুখী। বর্ধমানের মহারাজা এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

(৯) রাধাকৃষ্ণ মন্দির

কৃষ্ণ মন্দিরের নিকটেই এই মন্দিরটি একটি বটগাছের কাছে অবস্থিত। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

Scanned with OKEN Scanner

(১০) বটমঙ্গলা বা সর্বমঙ্গলা

কল্পবট বৃক্ষের উত্তর দিকে বটমঙ্গল দেবীর মন্দির অবস্থিত। মন্দির দুটি অংশে বিভক্ত। একটি হল বিমান অপরটি হল জগমোহন। বিমান হল মন্দিরের মূল অংশ এইস্থানে দেবী সর্বমঙ্গলা অবস্থান করেন। আর জগমোহন থেকে ভক্তগণ দেবীকে দর্শন করে থাকেন। দেবীর মূর্তিটি এখানে খুবই ছোট। দেবীর চারটি হাত, তিনটি চোখ। দুই হাতে দেবী ত্রিশূল ও গদা ধারণ করে আছেন। বাকী দুই হাতে আছে অভয় ও বরোদা। এই মন্দিরের দ্বারপাল হলেন ছায়া ও মায়া। বামন হল সিংহ, যিনি মন্দিরের সামনেই একটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবী সর্বমঙ্গলা সকল ভক্তের মঙ্গল প্রদান করে থাকেন বলে এই দেবীকে সর্বমঙ্গলা বলা হয়।

(১১) পঞ্চপাণ্ডব মহাদেব

এই মন্দিরটি বট মঙ্গলার সামনেই অবস্থিত। কথিত আছে, পঞ্চপাণ্ডব যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁদের একবছর অজ্ঞাতবাসকালে তীর্থযাত্রার পথে এই যজ্ঞবেদীতে এসেছিলেন। যখন তাঁরা এই স্থানে আসেন তখন সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার জন্য একরাত্রি এখানে থাকেন, এবং তাঁদের যাত্রার মঙ্গল কামনায় ভগবান বিষ্ণুর পূজা করেন। তাঁদের এই আগমনের প্রতীক হিসাবে এখানে পঞ্চপাণ্ডব মহাদেব বা পাঁচ মহাদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই পাঁচ মহাদেব হলেন, শ্রীমার্কণ্ডেয়, শ্রীযমেশ্বর, শ্রীলোকনাথ, শ্রীকপালমোচন, শ্রীনীলকান্ত এই পাঁচজন শিবকে শ্রীক্ষেত্রের অভিভাবক মনে করা হয়।

(১২) কানপাতা হনুমান

এখানে এক বৃহৎ আকারের হনুমান মূর্তি আছে। এতবড় হনুমান মূর্তি কোথাও দেখা যায় না। এই স্থানটি মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের কাছে অবস্থিত। এই স্থানের নাম 'কানপাতা হনুমান' কেন হল তার একটি কাহিনী আছে—

জগন্নাথদেবের মন্দির সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত। সমুদ্রমন্থনকালে তখন লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হয়। লক্ষ্মীদেবীকে জগন্নাথদেব বিবাহ করেন। মহাসমুদ্র হন জগন্নাথদেবের শ্বশুর।

রাত্রিতে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন মন্দির থেকে বেশ জোরে জোরে শোনা যায়। এর জন্য জগন্নাথদেবের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। তখন জগন্নাথদেব মহাসমুদ্রকে বলেন যে, এরকম শব্দ যেন না হয় যার জন্য তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। সেই থেকে সমুদ্রের ঢেউ-এর গর্জন জগন্নাথ মন্দিরে আর প্রবেশ করেনি। সেই সময় জগন্নাথদেব ভক্ত হনুমানকে ডেকে বলেন যে, সে যেন মন্দিরের দক্ষিণদ্বারের সামনে পাহারায় থাকে এবং লক্ষ্য রাখেন যেন সমুদ্রের গর্জন মন্দিরে প্রবেশ করছে কি না। সেই থেকে হনুমানজী কান পেতে আছেন আর লক্ষ্য রাখছেন যে সমুদ্রের গর্জন মন্দিরে প্রবেশ করছে কি না। সেই জন্য তাঁর পরিচয় হয়েছে 'কানপাতা হনুমান' নামে।

(১৩) যজ্ঞ নৃসিংহ মন্দির

এই মন্দিরটি পুরীর মন্দিরের অন্যতম প্রাচীন মন্দির। মূল মন্দিরের নির্মাণের পূর্বেই এই মন্দিরটি চোরগঙ্গদেব নির্মাণ করেছেন এবং নৃসিংহদেবকে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিয়মিতভাবে নৃসিংহদেবের পূজা-আরাধনা করতেন। যজ্ঞ নৃসিংহ মন্দিরটি শ্রীমন্দিরের

Scanned with OKEN Scanner

দক্ষিণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেই দেখা যায়। মুক্তি মণ্ডপের কাছেই মন্দিরটি অবস্থিত।

স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে যে, জগন্নাথদেব প্রথমে নৃসিংহদেব রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন। কিন্তু রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবানের ভয়ানক রূপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে তাঁর সুকুমার রূপের জন্য প্রার্থনা করেন। যার ফলে ভগবান বর্তমান রূপে আবির্ভূত হন। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের নবকলেবর অনুষ্ঠানে নৃসিংহদেব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই অনুষ্ঠানে নৃসিংহমন্ত্রও পাঠ করা হয়।

ওড়িশার অনেক প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন এই মন্দিরে দেখা যায়। মন্দিরের গায়ে দশাবতার, অষ্টদিকপালের মূর্তি, লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি ছাড়াও আরও নানান ভাস্কর্য খোদাই করা আছে। মন্দিরের গায়ে আরও বহু শিলালিপি খোদাই করা আছে। এই শিলালিপিগুলিতে জগন্নাথদেবের পূজা পদ্ধতি ও আরও অনেক তথ্য আছে।

(১৪) বটবিহারী জগন্নাথ

এই মন্দিরটিকে বট অবকাশ মন্দিরও বলা হয়। এখানে শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ দাসের সাথে মিলিত হয়েছিলেন যখন সাধু জগন্নাথ দাস ওড়িয়া ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবদ্ পাঠ করছিলেন। বটবিহারী জগন্নাথের মন্দিরটি কূর্মবেড়া প্রাচীরের গায়ে উত্তর দিকে মুখ করে অবস্থিত। এই মন্দিরের উত্তরদিকে বট গণেশের মন্দির। এই মন্দিরে পুরুষোত্তম জগন্নাথ দেবী লক্ষ্মীর সাথে মিলিত হন। জগন্নাথদেবের মূর্তিটি প্রায় উচ্চতায় ৫ ফুট। এই মন্দিরে নিয়মিত পুরাণ পাঠ করা হয়। মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের কাছে এই মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্য হল মুসলিম আক্রমণ থেকে ভগবানের মূল বিগ্রহটি রক্ষা করার জন্য।

(১৫) ক্ষেত্রপাল মহাদেব মন্দির

ক্ষেত্রপাল মহাদেব মন্দিরটি অনন্ত বসুদেব মন্দিরের কাছেই অবস্থিত। শ্রীমন্দিরের রক্ষাকর্তা হলেন ভগবান ক্ষেত্রপাল। জগন্নাথদেব দর্শনের পূর্বে ভগবান ক্ষেত্রপালকে পূজা করে তাঁর অনুমতি নিতে হয়। এই মন্দিরটি অনঙ্গ ভীমদেবের রাজত্বকালে নির্মিত হয়।

(১৬) ব্রজেশ্বরী

দেবী ব্রজেশ্বরী মন্দিরটি জগমোহনের খুব কাছেই অবস্থিত। ব্রজেশ্বরী হলেন ক্ষেত্রপাল শিবের শক্তি। ইনি ইন্দ্রাণী নামেও পরিচিত। দেবী ব্রজেশ্বরী বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন—এই মন্দিরটি হল দক্ষিণমুখী। সিংহাসনের নীচে শিবলিঙ্গের অবস্থান।

(১৭) নীলাচল উপবন

নীলাচল উপবন মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মেঘনাদ প্রাচীর ও কূর্মবেড়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মন্দিরের পশ্চিম দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে যে পথটি হনুমানজীর মন্দিরের সামনে দিয়ে গিয়েছে সেই পথে এগোলেই 'নীলাচল উপবন'-এ পৌঁছানো যায়। এটি হল জগন্নাথদেবের ফুলের বাগান। এখান থেকে প্রতিদিন মন্দিরের পূজার জন্য ফুল ও তুলসী পাতা সংগ্রহ করা হয়। এই ফুলের বাগানে সিদ্ধেশ্বর, চক্রনারায়ণ এবং ধবলেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। এই উপবনে একটি রাধাকৃষ্ণের মূর্তিও আছে।

Scanned with OKEN Scanner

(১৮) স্নানবেদী

এই স্নানবেদী মেঘনাদ প্রাচীরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এই বেদীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি উঁচু মঞ্চ স্থান আছে। প্রতিবছর স্নানযাত্রার দিনে সকল দেবতাদের এই স্থানে স্নান করানো হয়। এই অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে রথযাত্রার পনেরো দিন আগে স্নান পূর্ণিমার দিন। স্নানের জায়গাটি এতই উঁচু যে সকল ভক্তগণ মন্দিরের বাইরে থেকেও দেখতে পান।

(১৯) পঞ্চমুখী মহাবীর

এই পঞ্চমুখী মহাবীর মন্দির নীলাচল উপবনের মধ্যেই অবস্থিত। এই স্থানে মহাবীরের পাঁচটি মুখ। সেজন্য এই স্থানটি পঞ্চমুখী মহাবীর নামে খ্যাত।

(২০) নির্মাল্য খলা

নীলাচল উপবনের মধ্যেই এই বড় মণ্ডপটি অবস্থিত। এই মণ্ডপে জগন্নাথের মহাপ্রসাদকে শুকনা করে নির্মাল্য প্রস্তুত করা হয়। এই শুকনা নির্মাল্য নষ্ট হয় না, বহুদিন পর্যন্ত থাকে। এই মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র।

(২১) হরিসহদেব মন্দির

মূল মন্দিরের পূর্ব প্রান্তে বটবৃক্ষের উত্তরদিকে একটি ছোট মন্দির আছে। সেই মন্দিরের দেবতা হলেন হরিসহদেব মহাদেব। জগন্নাথদেবের সমস্ত গরুজাতীয় প্রাণীর রক্ষক ছিলেন হরিসহদেব। এই মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ আছে। একটি খুব ছোট আকারের বৃষভ লিঙ্গের দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছে।

(২২) ভগু গণেশ বা কাশির গণেশ মন্দির

এখানে প্রতিষ্ঠিত গণেশটি মহাদেব পুত্রকে কৌশলে পরাজিত করে কেমন যেন কাশি হয়েছে। এই মন্দিরটি সমুদ্রতীরের মন্দিরের পাশেই অবস্থিত। কেউ কেউ একে ভগ্ন গণেশ বা কাশি গণেশও বলে থাকে। এখানের গণেশ মূর্তি চতুর্ভুজ। মূর্তিটি একটি পাথর দিয়ে নির্মিত। মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় ৫ ফুটের মত।

(২৩) ক্ষীরচোরা গোপীনাথ

ভগবানের মন্দিরের ঠিক পাশেই ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরটি অবস্থিত। বালাসোর জেলার রেমুনাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের একটি মন্দির আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরী যাবার পথে এখানে এসেছিলেন এখানকার মন্দিরে গোপীনাথের যে মূর্তিটি নিত্য পূজা হচ্ছে সেই মূর্তিটি তারই অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে। কেন এই ভক্তের নাম তিনি একবার ক্ষীর চুরি করেছিলেন বলেই এর নাম হয় 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ'।

(২৪) মহালক্ষ্মী মন্দির

মহালক্ষ্মীর মন্দির কূর্মবেড়ার উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত মহালক্ষ্মীর মন্দিরকে চারটি অংশে ভাগ করা যায়—বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগ মণ্ডপ। গবেষকগণ মনে করেন এই মন্দিরটি আনুমানিক ১০৮০ খ্রিষ্টাব্দে অনন্তবর্মন চোড় গঙ্গদেব নির্মাণ করেছিলেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের স্থাপত্য ও শিল্পকলার সাথে মহালক্ষ্মী মন্দিরের শিল্পকলার বিশেষ মিল দেখা যায়। সেজন্য কেউ

কেউ মনে করেন মহালক্ষ্মী মন্দির ও শ্রীমন্দির এক সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে। মাদলা পাঁজিতে বলা হয়েছে যে রাজা মুকুন্দদেবের অমাত্য বিদ্যাধর মহাপাত্র এই মন্দিরের জগমোহন নির্মাণ করিয়েছিলেন।

এই মন্দিরের দৈনিক পূজা-পাঠ ও অন্যান্য কাজের জন্য এই মন্দিরকে সাতটি অংশে ভাগ করা হয়। যেমন—গর্ভগৃহ, ভদ্রাসন মণ্ডপ, জগমোহন, একান্ত বিজয় গৃহ, ভোগ মণ্ডপ ইত্যাদি।

মহালক্ষ্মী গর্ভগৃহে পদ্মের সিংহাসনে বসে আছেন। মহালক্ষ্মী চতুর্ভুজা, উপরের দুই হাতে তিনি পদ্মফুল ধারণ করে আছেন। নীচের দুটি হাতের একটি হাত অভয়মুদ্রা এবং অপরটিতে বরমুদ্রা। দুটি হাতি তাঁর দুই দিকে। সোনার কলসী থেকে তারা মায়ের গায়ে শুঁড় দিয়ে জল ঢালছেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে গঙ্গা ও যমুনার ছবি আছে। জগমোহনের দেওয়ালে হনুমান, গণেশ, নৃসিংহ, বরাহ, লক্ষ্মীর প্রভৃতির মূর্তি আছে। মা লক্ষ্মীকে সম্পদের দেবী বলা হয়ে থাকে। তিনি জগন্নাথদেবের শক্তি। দেবীর নাম অনুসারেই পুরীকে শ্রীক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস—সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্মীদেবী ভগবানের সাথে আছেন। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব বলদেব ও সুভদ্রাকে নিয়ে গুণ্ডিচাতে অবস্থান করেন। লক্ষ্মীকে তাঁদের সাথে নিয়ে যায়নি বলে তাঁর খুব রাগ হয়। রথযাত্রার তৃতীয় দিনে মা লক্ষ্মী গুণ্ডিচাতে গিয়ে রথের একটি অংশ ভেঙে নিয়ে আসেন। জগন্নাথদেব যখন ফিরে আসেন লক্ষ্মীদেবী অভিমানে শ্রীমন্দিরের দরজা খোলেন না। তখন জগন্নাথদেব নানারকম মিষ্টি কথায় মা লক্ষ্মীর রাগ ভাঙান। তারপর মা লক্ষ্মী জগন্নাথদেবকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেন। মালক্ষ্মী নিজস্ব রান্নাঘরে জগন্নাথদেবের জন্যে প্রতিদিন রান্না করেন। নানা ধরণের পিঠা জাতীয় খাবার তিনি রান্না করেন। সাধারণ ভক্তগণ সমস্ত

মন্দির পরিদর্শনের পর এই মন্দিরে একটু বসে বিশ্রাম নেন। ভক্তগণ মনে করেন এই মহালক্ষ্মী মন্দিরের জগমোহনে এসে বসলে মায়ের আশীর্বাদ পাওয়া যায়।

(২৫) ইন্দ্রাণী মন্দির

দেবী ইন্দ্রাণী মন্দিরটি বটবৃক্ষ মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইনি হলেন ক্ষেত্রপাল শিবের শক্তি মহা 'ব্রজেশ্বরী' নামে পরিচিত।

(২৬) নীলাদ্রি বিহার

এই স্থানটি মন্দিরের পশ্চিম-উত্তর কোণে পশ্চিম দ্বারের কাছে মেঘনাদ প্রাচীর বা কূর্ম প্রাচীরের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে জগন্নাথ মন্দির সম্পর্কে যাবতীয় গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। জগন্নাথদেব ও শ্রীমন্দির সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এই প্রদর্শনীতে দর্শনার্থীদের দর্শনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২৭) চাহনী মণ্ডপ

চাহনী মণ্ডপটি আনন্দ বাজারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। উল্টোরথের দিনে যখন জগন্নাথদেব মন্দিরে ফিরে আসেন তখন মহালক্ষ্মী এই মণ্ডপ থেকে উপবিষ্ট অবস্থায় জগন্নাথদেবকে দর্শন করে থাকেন। সেইজন্য এই মণ্ডপটি চাহনী মণ্ডপ নামে খ্যাত।

(২৮) বট গণেশ

বট গণেশের মন্দিরটি কল্পবট বৃক্ষটির নীচেই অবস্থিত। এই মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ১২ ফুট উঁচু। বট গণেশকে যথাক্রমে সিদ্ধি বিনায়ক, কল্প গণেশ, চিন্তামণি গণেশ, সিদ্ধা গণেশ প্রভৃতি নামেও ডাকা হয়ে থাকে। অনেকেরই মনে বিশ্বাস যে গণেশের পূজা শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে করলে মানুষের সকল বাধা দূর হয় ও মানুষ সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। সেজন্য একে সিদ্ধি বিনায়ক বলা হয়ে থাকে। এখানে গণেশের মূর্তিটি পাথর দিয়ে ৪ ফুট উচ্চতায় নির্মিত। গণেশ এখানে চতুর্ভুজ। দেহের রং সাদা ও লাল। কিন্তু মুখটি সাদা। সামনে আছে কালো পাথরের তৈরি ছোট একটি ইঁদুর, গণেশের বাহন। গণেশের প্রিয় খাদ্য লাড্ডু আর নারকেল।

(২৯) অনন্ত বাসুদেব

এই মন্দিরটি মুক্তি মণ্ডপের পাশেই অবস্থিত। এটি অতি প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের মূল মন্দিরটি মুখশালা থেকে ছোট। মন্দিরের ভিতরে শ্রীনারায়ণ অনন্ত নাগের উপর শুয়ে আছেন এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁর পদসেবা করছেন। নারায়ণের নাভিকুণ্ড হতে একটি পদ্মফুল বেরিয়ে এসেছে, তার উপর বসে ব্রহ্মা সৃষ্টির পরিকল্পনায় মগ্ন। এই অবস্থাকে সৃষ্টির আগের অবস্থার প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়।

(৩০) বলভদ্র ঠাকুর

পুজা পাণ্ডাদের ইষ্টদেবতা হলেন বলভদ্র ঠাকুর। এই দেবতার অবস্থান বটবৃক্ষ মূলে। এই কারণে এই দেবতাকে বটবলভদ্র ঠাকুর

বলা হয়ে থাকে। এখানকার এই বিগ্রহটি পিতলের ধাতুতে তৈরি। উচ্চতা ১ ফুট ৬ ইঞ্চি মাত্র।

(৩১) দধিবামন মন্দির

দধিবামনের মন্দির সূর্যমন্দিরের খুব নিকটেই অবস্থিত। এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণদেবের পূজা হয়। মন্দিরের দেওয়ালে গজলক্ষ্মীর একটি মূর্তি আছে।

(৩২) নবগ্রহ মন্দির

এই মন্দিরটি মহালক্ষ্মী মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত। এই মন্দিরের মধ্যেই নয়টি গ্রহ রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু প্রত্যেকেই পূজিত হন। এই মন্দিরে নবগ্রহ ছাড়া সমলেশ্বরী দেবীর মূর্তি, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমানের মূর্তি আছে। এঁনাদেরও এখানে পূজা করা হয়।

(৩৩) দিকপাল মন্দির

দিকপাল মন্দিরটি অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই মন্দিরে দশদিকের দশ অভিভাবক দেবতার পূজা করা হয়। হিন্দু পুরাতত্ত্ব অনুযায়ী দশদিকের উল্লেখ করা হয়েছে। দশদিকের দশজন দেবতা যারা নির্দিষ্ট দিনের দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

Scanned with OKEN Scanner

(৩৪) শ্রীরামচন্দ্র মন্দির

শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরটি দধিবামন মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত। এই মন্দিরে অবস্থিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন-এর পূজা করা হয়।

(৩৫) মার্জনা মণ্ডপ

এই মণ্ডপটি মূল মন্দিরের দক্ষিণদ্বারের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত। প্রতি বৃহস্পতিবারে আনুষ্ঠানিকভাবে মহালক্ষ্মী, মদনমোহন ও সরস্বতী শ্রীঅঙ্গ মার্জন করা হয়। এখানে এক সহস্র কুম্ভাভিষেক সমন্বয়ে পূজা হয় এবং রুক্মিণীর বিবাহ হয়। এজন্য এই মণ্ডপকে অনেকে বিবাহ মণ্ডপও বলে থাকেন।

(৩৬) একাদশী মন্দির

একাদশী মাতার মন্দির জগন্নাথদেবের মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। শ্রীমন্দিরের দেওয়ালে সাক্ষীগোপালের সামনে ছোট একটি মন্দিরে একাদশী মাতার পূজা করা হয়। বলা হয় জগন্নাথকে একাদশীমাতাকে বন্দী করে এখানে রেখেছেন। শ্রীমন্দিরে কেউ অনাহারে থেকে একাদশী পালন করেন না। মহাপ্রসাদ সেবনের পর এই ব্রত পালন করা হয়।

(৩৭) ভদ্রকালী বা বেড়াকালী

ভদ্রকালীর মন্দির নীলমাধব মন্দির বা মহালক্ষ্মী মন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কূর্ম বেড়ার ভেতরের দিকে পূর্বমুখী এই মন্দির। এই মন্দিরের কালীমাতা দেখতে খুবই ভয়ংকর। এখানকার কালীকে বেড়াকালী অথবা গুহ্যকালীও বলা হয়। এই কালী বিষ্ণু

দেবীর একহাতে খড়্গ ও অন্য হাতে মুণ্ড, গলায় তাঁর মুণ্ডমালা, মা কালীর উচ্চতা তিন ফুট। তবে বিগ্রহটি দারু নির্মিত। কথিত আছে—বর্তমানে মন্দিরে যে মূর্তিটি আছে তাঁর পেছনে প্রকৃত মূর্তিটি আছে এর কারণস্বরূপ বলা হয় যে, প্রকৃত কালীমূর্তির এতই তেজ ছিল যে অতীতে কেউ মন্দিরের সামনের পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারত না। সেই কারণের জন্য মরহট্টা রাজত্বকালে একজন বালক ব্রহ্মচারীর তত্ত্বধানে ওই কালী মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে প্রকৃত মূর্তির ঠিক সামনে দারুমূর্তি স্থাপন করা হয়। এই মূর্তির ডানহাতের পাশে একটা ছিদ্র আছে। ওই ছিদ্র দিয়ে প্রত্যহ ফুলচন্দন প্রবেশ করিয়ে দেবীকে পূজা করা হয়ে থাকে। এখানে মা কালীর বাহন সিংহ।

(৩৮) লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

নবগ্রহ মন্দিরের পূর্বদিকে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তির সাথে রাধাবল্লভ (রাধা-কৃষ্ণ) পূজিত হয়।

(৩৯) পাতালেশ্বর

পাতালেশ্বর মন্দিরটি কূর্মবেড়ার উত্তর দ্বারের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই মন্দিরটি হল পূর্বমুখী এবং মেঝের তলায় মন্দিরের অর্ধাংশ অবস্থিত। অর্থাৎ শ্রীমন্দিরের ভূমি থেকে ২০ ফুট নীচে এই মন্দিরটি। ২২ মিটার নীচে নেমে তবে শিবলিঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। শোনা যায় বালি পাতালেশ্বর নাম নিয়ে এই মন্দিরে পূজিত হন।

(৪০) পাদপদ্ম

শ্রীমন্দিরের উত্তর দ্বারের পূর্বদিকে পাদপদ্ম বা শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন আছে। এখানে দাঁড়িয়ে নীলাচল দর্শন করা হয়। প্রথমে এটি

Scanned with OKEN Scanner

গরুড় স্তম্ভের পাশে ছিল। পরবর্তীকালে এই পাদপদ্মকে বর্তমান স্থানে নিয়ে আসা হয়।

(৪১) সূর্যনারায়ণ মন্দির

এই মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৬৩ ফুটের কাছাকাছি। মন্দিরটি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের কাছেই পূর্বদিকে অবস্থিত। মন্দিরটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—বিমান, জগমোহন এবং নাটমন্দির। গবেষকগণের মতানুযায়ী প্রথমে এটি ইন্দ্রের মন্দির ছিল। পরবর্তীকালে কোণারকের সূর্যমন্দিরের ভগ্নদশাহেতু সূর্যনারায়ণের এই বিগ্রহটি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কোণারক থেকে পুরীর মন্দিরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই থেকেই এই মন্দিরটি সূর্যনারায়ণ মন্দির নামে পরিচিত হয়।

মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে সাতটি ঘোড়ায় টানা রথে সূর্যনারায়ণ দেব বিরাজমান। অপর একটি ধাতু নির্মিত সূর্যনারায়ণের মূর্তি জগমোহনে দেখা যায়। ঠিক রথের মতোই দেখতে একটি কাঠের সিংহাসনে তিনি বসে আছেন। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে সূর্যনারায়ণের পিছনে অপর একটি মূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তিটি পশ্চিমমুখী অর্ধভগ্ন অবস্থায় ভালোভাবে বোঝা যায় না। গবেষকগণের মতে এই মূর্তিটি ইন্দ্রদেবের মূর্তি। এখানে সূর্যনারায়ণ দেব ছাড়াও আরও কিছু দেবতার পূজা করা হয়। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ ষষ্ঠীতে এখানে চৈত্র গণ্ডিচা পালন করা হয়। এছাড়া শাম্বদশমী, বসন্ত পঞ্চমী প্রভৃতি কতকগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান পালিত হয়। এখানে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরে একটি নিজস্ব রান্নাঘর আছে। এই মন্দিরের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো কোন ছেলেমেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পাকাপাকি কথাবার্তা এখানে হয়ে থাকে এবং মা-বাবারা সূর্যদেবের নির্দেশে ছেলেমেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

(৪২) বেণুমাধব মন্দির

বেণুমাধবের মন্দিরটি বিমলা মন্দিরের উত্তরদিকে অবস্থিত। মন্দিরের মুখটি পূর্বদিকে। এই মন্দিরে জগন্নাথদেব বেণুমাধব রূপে অবস্থান করছেন। এখানে এক জায়গায় বহু দেবদেবীর একসাথে পূজা হয়ে থাকে। যেমন—হনুমান, রামচন্দ্র, ধেনু গোপাল, নন্দ যশোদা, সুদামা, গোপেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি। এছাড়াও এখানে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার বিগ্রহ পূজা হয়। এই মন্দিরে একটি পাদপদ্মও আছে, পাদপদ্মে একটি তুলসী গাছ আছে।

(৪৩) কুন্তাম চণ্ডী মন্দির

এই দেবীর শরীর হলো কুকুরের মতো এবং মাথাটি দেবী চণ্ডীর মতো। মন্দিরটি অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের পিছনে অবস্থিত। তন্ত্র পূজা পদ্ধতি অনুযায়ী দেবতার নৈবেদ্য ও চণ্ড নৈবেদ্য ভৈরবীকে প্রদান করা হয়। পূর্বে জগন্নাথদেবকে তন্ত্র দেবতা হিসাবে পূজা করা হত এবং চণ্ড প্রসাদ শ্বাণ ভৈরবীকে প্রদান করা হত। সেইজন্য দেবী কুন্তাম চণ্ডী জগন্নাথদেবের পার্শ্ব দেবতা হিসাবে ছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীমন্দিরের সিংহাসনের পাশ থেকে স্থানান্তরিত করে আলাদা মন্দিরে রাখা হয়েছে।

(৪৪) মার্কণ্ডেয় মন্দির

এটি শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গটি মেঝের থেকে ৭-৮ ফুট নীচে অবস্থিত। শঙ্খ পুরাণে কথিত আছে প্রবল প্লাবনে যখন মার্কণ্ডেয় ঋষি ভেসে যাচ্ছিলেন তখন তাকে ভগবান উদ্ধার করেন এবং এখান থেকেই

Scanned with OKEN Scanner

ভগবানের উপাসনা করতে বলেন। এই মন্দিরে একটি মাধব-এর মূর্তিও আছে। মন্দিরটি সর্বমঙ্গলা মন্দিরের কাছে অবস্থিত।

(৪৫) মুক্তেশ্বর মহাদেব

মুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি মুক্তি মণ্ডপের পূর্বদিকে অবস্থিত। এই মন্দিরটি অনঙ্গমোহন দেবের সময় নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরটির পশ্চিম দিকে মুখ করে মহাদেব বসে আছেন। ব্রাহ্মণগণ মহামুক্তি লাভের জন্য এই মন্দিরে বসে মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করে থাকেন।

(৪৬) দেবসভা মণ্ডপ

এই মণ্ডপটি অতি পবিত্রস্থান বলে বিবেচিত। এখানে সকলে সমবেত হয়ে বিচার বা আলোচনা করা হয়। জগন্নাথদেবের কোন সমস্যার সমাধান করতে দেবতারা, ঋষিগণ, নর্তকীরা আরও অনেকে সমবেত হয়ে আলোচনা করেন।

(৪৭) নীলমাধব

নীলমাধবের মূর্তিটি কালো কষ্টি পাথরে নির্মিত। নীলমাধবের বাঁদিকে জগন্নাথদেবের একটি ছোট দারুমূর্তি আছে। আর ডানদিকে শ্রীকৃষ্ণের একটি ছোট মূর্তি আছে। এই মন্দিরটি ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরের খুব নিকটেই অবস্থিত। পূর্বমুখী এই মন্দিরটির দুটি অংশ—গর্ভগৃহ ও জগমোহন। নীলমাধবকে নীলাচলের মূল দেবতা হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

নীলাচল পাহাড়ের উপর গভীর জঙ্গলে শবররাজ বিশ্ববসু নীলমাধবের পূজা করতেন। নীলমাধব হলেন সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদায়ক। তিনিই মোক্ষদান করেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্দেশে তাঁর পুরোহিতের ভাই বিদ্যাপতি নীলমাধবের সন্ধান করতে বের হলেন। এবং বিশ্ববসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অবশেষে যে গোপন জায়গায় শবররাজ বিশ্ববসু নীলমাধবের পূজার্চনা করতেন সেই স্থানের সন্ধান বিদ্যাপতি জানতে পারলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতির কাছ থেকে সব খবর জানার পর নীলমাধবকে পাবার আশায় তিনি তাঁর সৈন্যসামন্তদের নিয়ে সপরিবারে অগ্রসর হলেন। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার আদেশে রাজার সঙ্গে গেলেন। কিন্তু তিনি যাবার পথেই জানতে পারলেন যে নীলমাধবের মূর্তি অন্তর্ধান হয়েছে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের দর্শন করতে না পেরে ভীষণভাবে তিনি ভেঙে পড়লেন। একদিন রাত্রে মহারাজকে শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নাদেশ দিলেন যে তিনি দারুব্রহ্মরূপে তাঁর নিকটে আসছেন। শেষ পর্যন্ত মহারাজ শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দেব, সুভদ্রাদেবী এবং ভগবান বলভদ্রের বিগ্রহ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন।

পণ্ডিতগণ বলেন নীলমাধব হলেন তিনজন দেবতার সম্মিলিত রূপ। নীলমাধব = নীল + মা + ধব। নীল হলো জগন্নাথদেব। মা অর্থাৎ মা সুভদ্রা এবং ধব অর্থাৎ সাদা যা ভগবান বলভদ্রের প্রকাশ অর্থাৎ নীলমাধব। এইভাবে পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করে গেছেন নীল-মা-ধব একত্রে হলেন জগন্নাথ-সুভদ্রা- বলরাম।

(৪৮) দেবী বিমলার মন্দির

রোহিণী কুণ্ডের সামনে কূর্ম বেড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দেবী বিমলা মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির প্রথমে মাদলা-পাঁজি অনুযায়ী যযাতি

Scanned with OKEN Scanner

কেশরীর সময়ে নির্মাণ হয়েছিল। বর্তমানে মন্দিরটি গঙ্গবংশীয়দের রাজত্বের সময় পুনর্নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এই মন্দিরটি জগন্নাথদেবের মন্দিরের চাইতে পুরোনো। মৎস্যপুরাণে বিমলা মন্দিরের উল্লেখ থাকলেও জগন্নাথ মন্দিরের কোন উল্লেখ নেই। আর সমুহ পুরাণের মধ্যে মৎস্য পুরাণই হলো প্রাচীনতম।

বিমলাদেবীর মন্দিরটি চারভাগে ভাগ করা যায়। (১) বিমান—মূল মন্দির দেবী বিমলা যেখানে অবস্থান করছেন। (২) জগমোহন—যেখান থেকে দেবীকে দর্শন করে থাকেন ভক্তরা। (৩) নাটমন্দির—যেখানে দেবীর নৃত্যগীত ইত্যাদি করা হয়। (৪) ভোগমণ্ডপ—দেবীর ভোগ যেস্থানে প্রদান করা হয়।

দেবী বিমলা মায়ের মূর্তিটি কষ্টিপাথরে নির্মিত। দেবী একটি পদ্মফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। দেবী বিমলা হলেন মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহা সরস্বতীর মিলিতরূপ। দেবী বিমলার পার্শ্বদেবীরূপে মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা ও দেবী চামুণ্ডা অধিষ্ঠান করছেন। এছাড়াও দেবীর দু'পাশে দুটি প্রস্তর নির্মিত মূর্তি ছায়া ও মায়া অবস্থান করছেন এদের স্থানীয় নাম দুধাই ও সরথাই।

এই মা বিমলাদেবীর মন্দিরটি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চারটি পীঠের মধ্যে অন্যতম পীঠ। বাকি তিনটি পীঠ হলো কন্যাকুমারী, কামাখ্যা জ্বালামুখী। তন্ত্রমতে মা দুর্গাই এখানে দেবী বিমলা। দেবীর পূজা তন্ত্রমতে এখানে হয়ে থাকে। ধ্যানমন্ত্র হিসাবে চণ্ডীর ধ্যানমন্ত্র ব্যবহার হয়। পঞ্চম-কারের অনুকল্পে পূজা করা হয়। মৎস্যের বদলে এখানে ঘি দিয়ে রান্না করা শাক, মাংসের পরিবর্তে আদাকুচি, মদের পরিবর্তে কাঁসার পাত্রে ডাবের জল। মুদ্রার পরিবর্তে জলে গোলা ময়দা ও ঘি দিয়ে একপ্রকার সিন্নি তৈরি করা হয় এবং মৈথুনের বিকল্প হিসাবে রক্ত-চন্দন মাখানো অপরাজিতা ফুল।

বিমলাদেবীর মন্দিরটি একান্ন পীঠের মধ্যে অন্যতম একটি পীঠ। দেবী ভাগবতে উল্লেখ আছে যে পুরীতে সতীর দুটি চরণ পড়েছে। এইজন্য এর নাম হয় পাদপীঠ। দেবী বিমলাকে এইজন্য পাদপীঠেশ্বরী বলা হয়। অনেক গবেষকগণের মতে পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মিত হওয়ার আগে থেকেই এখানে বিমলাদেবী পূজিত হতেন। এই মন্দিরের চারপাশে বহু শিবমন্দির ছিল। তন্ত্রচূড়ামণি মতে এই স্থানে সতীর নাভী পড়েছিল। সেইজন্য এই ক্ষেত্রের অন্য নাম ছিল নাভিক্ষেত্র। যেহেতু পুরীর আর এক নাম শঙ্খ-ক্ষেত্র সেইজন্য এই ক্ষেত্রকে শঙ্খ-নাভি ক্ষেত্রও বলা হয়। শারদীয়া পূজার সময় এই স্থানে মা বিমলাদেবীর ষোলোদিন ব্যাপী বিশেষ পূজার্চ্চনা উৎসবাদি হয়ে থাকে। এই ষোলোদিন দেবীকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত করা হয়। প্রথম ও শেষ চারদিন দেবীর স্বাভাবিক সাজ হয়। দ্বিতীয় দিন হইতে দেবী নানা সাজে সজ্জিত হন। দ্বিতীয় দিনে সাজেন ভুবনেশ্বরী, তৃতীয় দিনে সাজেন বনদুর্গা, চতুর্থদিনে সাজেন রাজরাজেশ্বরী, পঞ্চম দিনে সাজেন উগ্রতারা, ষষ্ঠদিনে সাজেন মাতঙ্গিনী , সপ্তম দিনে বগলা, অষ্টম দিনে নারায়ণী, নবম দিনে সিংহবাহিনী, দশম দিনে জয়দুর্গা, একাদশ দিনে শূলী দুর্গা, দ্বাদশ দিনে হরচণ্ডীর বেশে সাজেন। বিমলা মন্দিরের একটি প্রধান উৎসব হলো দুর্গামাধব পূজা। আশ্বিন মাসের মহানবমী পর্যন্ত এই ষোলোদিন এই উৎসব পালিত হয়। এই ষোলোদিনের মধ্যে আটদিন দুর্গা (শক্তি) এবং মাধব (বিষ্ণু) একত্রে পূজিত হন। পরবর্তী আটদিন দুর্গা ও মাধবকে পালকিতে চড়িয়ে দোল মণ্ডপ সাহীতে অবস্থিত নারায়ণী মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীক্ষেত্রে একে শাক্ত ওড়িচা বলা হয়।

মা বিমলাদেবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাহাত্ম্য হলো এই যে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে যে অন্নভোগ দেওয়া হয়, তা এরপর মা

Scanned with OKEN Scanner

বিমলাকে সমর্পণ করা হয়। এই অন্নভোগ মা বিমলাকে সমর্পণ যদি না করা হয় তাহা হইলে ইহা মহাপ্রসাদে পরিণত হয় না।

(৪৯) বাইশি বাহাচ

সিংহদ্বার অতিক্রম করে মূল মন্দিরে প্রবেশের পথেই বাইশটি সিঁড়ি পার হতে হয়। এই বাইশটি সিঁড়ি কূর্ম বেড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। উড়িষ্যা ভাষায় ইহাকে বাইশি বাহাচ বলা হয়। এই স্থানটি অতি পবিত্র বলে মনে করা হয়। মহাপ্রভু জগন্নাথকে দর্শন করার পূর্বে এই বাইশটি সিঁড়ি অতিক্রম করলে দর্শনার্থীর দেহ ও মন পবিত্রতায় পূর্ণ হয়ে যায়। বহু ব্যক্তি এই স্থানে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে থাকেন। এই সিঁড়ির ধুলো অনেকেই গায়ে মাখেন ও মাথায় দেন। বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানের দীর্ঘজীবন কামনায় ছেলেমেয়েদেরকে এই স্থানে গড়াগড়ি খাওয়ান। গবেষকগণ এই বাইশটি সিঁড়ির মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেছেন যে, বাইশটি সিঁড়ি হলো পঞ্চভূত, পঞ্চইন্দ্রিয়, ষড়রিপু, তিনগুণ এবং মন বুদ্ধি ও অহংকারের সমাহার। অর্থাৎ বাইশটি সিঁড়ি হলো পঞ্চভূত + পঞ্চ ইন্দ্রিয় + ছয়টি রিপু + তিনটি গুণ + মন + বুদ্ধি + অহংকার।

আবার অনেকের মতে প্রথম পাঁচটি সিঁড়ি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—মানুষের এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। পরবর্তী পাঁচটি হলো প্রাণের প্রতীক। পরের পাঁচটি সিঁড়ি হলো রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—এই পাঁচপ্রকার অনুভবের প্রতীক। এর পরবর্তী পাঁচটি সিঁড়ি হলো ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচ প্রকার ভূত অর্থাৎ মৌলের প্রতীক। মোষ দুটি হলো মানুষের বুদ্ধি ও অহংকারের প্রতীক। এই বাইশটি সিঁড়ি হলো যোগদর্শনের বাইশটি ধারা যা ধাপে ধাপে

সাজানো আছে। এই বাইশটি ধাপকে অতিক্রম করার পর জগন্নাথদেবের কাছে পৌঁছোনো যায়। তাঁর কাছে যদি আসতে হয় তাহলে সমস্ত রকম জাগতিক মোহকে পরিত্যাগ করতে হবে।

(৫০) রামাভিষেক

বাইশটি সিঁড়ির দক্ষিণে আর একটি মন্দির আছে যেখানে শ্রীরামচন্দ্র অবস্থান করছেন। শ্রীরামচন্দ্র ছাড়াও লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্তিও আছে। পার্শ্বদেবতা রূপে শ্রীশ্রীগণেশ ও নৃসিংহদেবের মূর্তি রয়েছে। কাশীবিশ্বনাথের মন্দিরের খুব কাছেই এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরে প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ করা হয়। বিশ্বনাথ মন্দিরের ভিতর থেকেই রামায়ণ শোনেন। রামচরিত মানসে উল্লেখ আছে যে শিব রামায়ণ শুনতে খুবই পছন্দ করতেন।

এসব ছাড়াও আরও বিভিন্ন মন্দির আছে, যেমন—গৌড়ীয় ও নৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র মন্দির, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, পশুনাথ মহাদেবের মন্দির, চক্রনারায়ণ মন্দির, গুরুজী সোপান, শীতলা মন্দির, ঝড়েশ্বরী মন্দির, গণেশ মন্দির, উত্তরায়ণি মন্দির, পুরাণ নৃসিংহ মন্দির ইত্যাদি।

পুরীর পাঁচটি পুণ্য সরোবর

ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বহু লোক এই পুরীধামে পরিভ্রমণে আসেন। পুরী হলো ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। সমগ্র পুরী শহর জুড়ে রয়েছে অসংখ্য মঠ-মন্দির। মঠ-মন্দির ছাড়াও রয়েছে পুরীতে পাঁচটি পুণ্য সরোবর সেগুলি হলো—(১) মার্কণ্ডেয় পুষ্করিণী (২) রোহিণী কুণ্ড (৩) নরেন্দ্র

Scanned with OKEN Scanner

সরোবর (৪) শ্বেতগঙ্গা পুষ্করিণী (৫) ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। এছাড়া আছে মহাব্ধি অর্থাৎ সমুদ্র। তীর্থযাত্রীরা এইসব সরোবরের জল মাথায় স্পর্শ করে পুণ্য অর্জন করে থাকেন। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের সারা বছর ধরে যেসব মহাঅনুষ্ঠানগুলি হয়ে থাকে সেগুলির সাথে এই পবিত্র জলাশয়গুলি বিভিন্নভাবে যুক্ত।

(১) মার্কণ্ডেয় পুষ্করিণী—জগন্নাথ মন্দিরের উত্তরে মন্দির থেকে ১ কিলোমিটার দূরে এই পুষ্করিণীটি অবস্থিত। এই পুষ্করিণীটি আনুমানিক প্রায় চার একর জায়গায় অবস্থিত। মার্কণ্ডেয় সাহীতে এই পুষ্করিণী। পুরাণে উল্লেখ আছে এই যে, মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবান বিষ্ণুর আদেশে জগৎ সৃষ্টি করবার আগেই এই পুষ্করিণী খনন করেছিলেন। এই পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকে একটি শিব মন্দির আছে। উত্তর দিকের ঘাটে আটটি পাথরের মূর্তি আছে। প্রতিটির উচ্চতা প্রায় চার ফুট। চতুর্ভুজ এই মূর্তিগুলি অষ্টমাত্রকা নামে বিখ্যাত। মূর্তিগুলির কোলে একটি করে শিশু আছে। বহুজনের বিশ্বাস এই পুষ্করিণীতে স্নান করলে সন্তানসম্ভবা হয়। এই সরোবরটি অত্যন্ত পবিত্র।

(২) রোহিণীকুণ্ড—বর্তমানে এই জলাধারটির কোন অস্তিত্ব আর নেই। তবে জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরে বিমলা দেবীর মন্দিরের কাছে একটি জলপূর্ণ কুণ্ড আছে। এটাই হলো রোহিণী কুণ্ড। এই কুণ্ডটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ভালোভাবে যদি লক্ষ্য করা যায় তবে এই কুণ্ডের জলে একটি সুদর্শন চক্র এবং একটি চতুর্ভুজ কাক দৃষ্টিগোচর হয়। এই কাকটিকে 'ভূষণ্ডী কাক' বলা হয়। কুণ্ডের অপরপ্রান্তে একটি নীলচক্ররূপে একটি নাভিচক্র দৃষ্টিগোচর হয়।

স্কন্দপুরাণে রোহিণীচক্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে, জগন্নাথদেবের মন্দির আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মাকে আনতে ইন্দ্রলোক

গেলেন। কিন্তু সেখানে ব্রহ্মার অপেক্ষায় রাজাকে বহুদিন থাকতে হল। এই দীর্ঘদিন কেটে যাওয়ার ফলে অবাবহৃত মন্দিরটি বালিতে ঢাকা পড়ে যায়। এদিকে গালরাজা মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পুরশ্চরণ করতে শুরু করে দিলেন। তিনি জানতে পারেন যে একটি নীলচক্র বালির মধ্যে জেগে আছে। তিনি যখন সৈন্যসামন্ত নিয়ে পুরীর উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় তার ঘোড়া বালির উপর জেগে থাকা চক্রে হোঁচট খায়। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের বালি সরিয়ে একটি মন্দিরের সন্ধান পান। তখন তিনি বহু লোকজন দিয়ে এই বালির স্তূপের তলা থেকে মন্দিরটিকে উদ্ধার করেন। এভাবে মন্দির নির্মাণের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার জন্য গাল রাজা খুবই খুশি হলেন। তিনি এই মন্দিরে মাধবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা-পাঠ করতে লাগলেন।

বহু বছর অতিক্রম হয়ে যাবার পর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন ইন্দ্রলোক থেকে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর তৈরি করা মন্দিরে গাল রাজা মাধবের মূর্তি পূজা করছেন। তখন তিনি গাল রাজার নিকট মন্দিরের অধিকার দাবি করলে গাল রাজা তা দিতে অস্বীকার করেন। গাল রাজার দাবি তিনিই এই মন্দিরটি উদ্ধার করেছেন। সুতরাং এই মন্দিরের অধিকার একমাত্র তাঁরই। মন্দিরের পাশে একটি কল্পবটে থাকতেন একটি 'ভূষণ্ডী কাক', বহুকাল ধরে 'ভূষণ্ডী কাকটি' ওই গাছের উপর বসে রামনাম করত। তিনি এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের কিছু কচ্ছপ ব্রহ্মার কাছে সাক্ষ্য দিলেন যে এই মন্দির রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নই নির্মাণ করেছেন। এইরূপ সাক্ষ্যদানের পর গাল রাজা তা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নকে মন্দির ফিরিয়ে দিলেন। তবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন গাল রাজাকেই এই মন্দির পরিচালনা করার সব দায়দায়িত্ব দিলেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত মাধবকেই নীলমাধব রূপে গর্ভগৃহে রত্নবেদীর উপর স্থাপন করলেন। পুরাণে যা উল্লেখ আছে সেই বর্ণনা অনুযায়ী 'ভূষণ্ডী কাক' এই রোহিণী কুণ্ডের

জল পান করে চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেন। শবররাজ বিশ্ববসু এই রোহিণীকুণ্ডের জল দিয়েই নীলমাধবের পূজার্চ্চনা করতেন।

(৩) নরেন্দ্র সরোবর—এই পুকুরটি গঙ্গরাজ বংশের রাজত্বকালেই খনন করা হয়। মোট প্রায় আট একর জায়গা জুড়ে তৈরি হয় এই পুকুরটি। জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর পূর্ব দিকে এক কিলোমিটার দূরে এই পুষ্করিণীটি অবস্থিত। পুকুরটি দৈর্ঘ্যে ৮৭৩ ফুট এবং প্রস্থে ৮৩৪ ফুট। প্রতি বৎসর অক্ষয়তৃতীয়ার দিন এখানে চন্দন যাত্রা উৎসব পালিত হয়। সেইজন্য এই সরোবরকে চন্দন সরোবরও বলা হয়। এই সরোবরের মাঝখানে নরেন্দ্র সরোবরের মন্দিরটি অবস্থিত। জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলভদ্রের দারুমূর্তি এই মন্দিরের মধ্যেই আছে। প্রত্যেক স্নান পুর্ণিমার সময় যখন মন্দির বন্ধ থাকে তখন দর্শনার্থীরা এই সরোবরে এসে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করেন। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনও এই সরোবরে জগন্নাথদেবের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম এই সরোবরে হাওয়া খেতে আসেন। সেই সময় জগন্নাথদেব সপরিবারে এই সরোবরে নৌকাবিহার করেন। সরোবরের মাঝখানে যে মন্দিরটি অবস্থিত সেই মন্দিরটি হলে জগন্নাথের পিসি কুন্তীর বাড়ি। চন্দনযাত্রা উৎসব যতদিন পালিত হ ততদিন চারটি করে বড় আকারের মালপোয়া তৈরি করে জগন্নাথদেবে ভোগ দেওয়া হয়। এই সময় জগন্নাথ ২১ দিন এই সরোবরে অবস্থ করেন। সেই সময় বহু ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে এই স্থানে। এ স্থানে বৃহৎ মেলাও বসে। প্রত্যেক বছর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্র অনুযায়ী কুন্তী শ্রীমন্দিরে এসে জগন্নাথদেবকে নিমন্ত্রণ করে যাবার প জগন্নাথদেব নরেন্দ্র সরোবরে যান। সরোবরে নৌকাবিহারের প দেবতাদের স্নানপর্ব শুরু হয়। তিনটি আলাদা আলাদা কুণ্ডে জল

মধ্যে চন্দন, কস্তুরী ইত্যাদি মিশিয়ে স্নান করানো হয় দেবতাদের। এরপর দেবতাদের পুনরায় নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীমন্দিরে।

(৪) শ্বেতগঙ্গা পুষ্করিণী—এই শ্বেতগঙ্গা পুষ্করিণীটি স্বর্গদ্বার রোডের উপর 'গঙ্গামাতা' মঠ-এর সম্মুখেই অবস্থিত। এই পুষ্করিণীকে 'শ্বেতগঙ্গা'-ও বলা হয়ে থাকে। কারণ ভক্তদের মনে বিশ্বাস যে, এই পবিত্র পুষ্করিণীতে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের ফল পাওয়া যায়। এখানে গঙ্গামাতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা আছে। এছাড়া মৎস্য মাধব এবং শ্বেত মাধবের মূর্তিও আছে।

(৫) ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—এই সরোবরটি গুণ্ডিচা মন্দিরের সামনেই উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে এই মন্দিরটি ৪৮৬ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৩৯৬ ফুট।

এই সরোবরটি কিভাবে তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে বহু পৌরাণিক কাহিনী আছে। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের পূর্বে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। এই যজ্ঞের সময় তিনি কয়েক সহস্র গরু ব্রাহ্মণদের দান করেন। সেই সব গরু যেখানে রাখা হয়েছিল সেই জায়গাটি গরুদের পায়ের ক্ষুরের আঘাতে সমস্ত মাটি সরতে সরতে একটি বৃহৎ গর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরে যখন গরুগুলিকে উৎসর্গ করা হয় তখন ওই গাভিগুলির উৎসর্গীকৃত জল সেই গর্তে পড়ে এক বৃহৎ সরোবরে পরিণত হয়। এই সরোবরটিই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নামে খ্যাত।

মহাদধি অর্থাৎ সমুদ্র—পুরীর সমুদ্র সকল পর্যটকদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। কেবল ভারতবর্ষ নয় বিশ্বের সকল পর্যটকদের নিকট

বিশেষ আকর্ষণ হলো পুরীর এই মহাসমুদ্র। তবে পুরীর সমুদ্রের তীর্থক্ষেত্র হিসাবেও মহিমা অপরিসীম। বিভিন্ন পুরাণে উল্লেখ আছে সত্যযুগে সমুদ্র মন্থন করার সময় দেবতারা মহালক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই মহালক্ষ্মীকে বিবাহ করেন বিষ্ণু অর্থাৎ জগন্নাথদেব। মহালক্ষ্মী হলেন সমুদ্রের দেবতা বরুণের কন্যা। সেইজন্য প্রতি অমাবস্যায় নারায়ণরূপী জগন্নাথ সমুদ্রযাত্রা করেন। সমুদ্রে স্নান করে বেলাভূমিতে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করা হয়।

জগন্নাথদেবের মন্দিরে পূজা ও উৎসব

সারাবৎসর ধরেই বিভিন্ন পূজা ও উৎসব জগন্নাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই উৎসবগুলির মূল উদ্দেশ্য হলো ভক্তগণের হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির জাগরণ মুখরিত করে রাখা। এই সব উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন পুরাণেও উল্লেখ আছে। যে সব উৎসব মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার মধ্যে প্রধান উৎসব হল বারোটি, যথা—স্নান যাত্রা গুণ্ডিচা যাত্রা, শয়ণ যাত্রা, দক্ষিণায়ন যাত্রা, পার্শ্বপরিবর্তন, দেবোত্থান যাত্রা, প্রাবরণ যাত্রা, পৌষাভিষেক যাত্রা, উত্তরায়ণ যাত্রা, দোলযাত্রা দমনক যাত্রা, চন্দন যাত্রা। এছাড়াও আরও নানা পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নীচে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল।

• **চন্দন যাত্রা**—বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চন্দনযাত্রা শুরু হয়। চন্দনযাত্রা উৎসব ৪২ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই ৪২ দিনকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে ২১ দিন করে। প্রথম ২১ দিন জগন্নাথদেবের প্রতিনিধিরা নরে সরোবরে অংশগ্রহণ করে থাকেন। একে বলা হয় 'বাহারচন্দন এরপরের ২১ দিন মন্দিরের ভিতরে উৎসব চলে। একে বলা 'ভিতর চন্দন'।

• **রাজেন্দ্রাভিষেক**—এই উৎসবটি জ্যৈষ্ঠ মাসের দশম দিনে শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শ্রীমন্দিরে এই দিনে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের অভিষেক অনুষ্ঠান হয়।

• **দক্ষিণায়ন**—এই উৎসবটি কর্কট সংক্রান্তির দিন পালন করা হয়ে থাকে। সূর্যদেব এইদিন থেকে জলবিষুব অভিমুখী হয়। বিশেষ সাজ-পোশাকে দেবতাদের সুসজ্জিত করা হয়। চন্দন নিবেদন করা হয়। দেবতারা যদি এইদিন রথের উপর থাকে তবে সেইখানেই এই নীতি পালিত হয়।

• **শীতল ষষ্ঠী**—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি মহালক্ষ্মীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। শিব ও পার্বতীর বিবাহ বন্ধনের পরে এখানে তাঁদের নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁদের অভিনন্দিত করেন ঢোলগোবিন্দ ও মহালক্ষ্মী।

• **নবদিন যাত্রা উৎসব**—রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেব, সুভদ্রাদেবী, ভগবান বলভদ্র শ্রীমন্দির হইতে বাহির হয়ে গুণ্ডিচাতে অবস্থান করেন। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া হইতে নবমী পর্যন্ত এই সাতদিন গুণ্ডিচা মন্দিরে নানান উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এই উৎসবগুলিকে 'নবদিন যাত্রা' বলা হয়।

• **গণেশ চতুর্থী উৎসব**—ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন গণেশের মন্দিরে গণেশ পূজা করা হয়ে থাকে।

• **ঝুলনযাত্রা উৎসব**—শ্রাবণ মাসের শুক্লা দশমী থেকে জগন্নাথদেবের মন্দিরে ঝুলনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান সাতদিন ধরে চলে।

• **সন্ধ্যা দর্শন**—আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীর দিন অর্থাৎ দেবতাদের গুণ্ডিচা থেকে ফিরে আসার আগের দিন এই যাত্রা উৎসব হয়ে থাকে। সেই দিন সন্ধ্যায় হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে গুণ্ডিচা মন্দিরে ভগবানকে শেষ দর্শনের উদ্দেশ্যে। এই দর্শন অতি পবিত্র বলে মনে করা হয়। অনেকের ধারণা গুণ্ডিচা মন্দিরে ভগবানকে দর্শন করলে আর জন্ম নিতে হবে না।

Scanned with OKEN Scanner

• **পুষ্যাভিষেক উৎসব**—পৌষমাসের পূর্ণিমার দিন এই উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এই দিনে পবিত্র জলে দেবতাদের পিতলের আয়নায় গঠিত প্রতিবিম্বকে স্নান করানো হয়। জগন্নাথদেবের আর এক অবতার শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান এখানে অনুষ্ঠিত হয়। সুগন্ধী জল ৮১ কলসী, ২১ কলসী ঘি দিয়ে রামচন্দ্রকে অভিষেক করানো হয়। এই অনুষ্ঠানে লক্ষ্মণ ও সীতাও উপস্থিত থাকেন। এই অনুষ্ঠানটিকে রামাভিষেকও বলা হয়।

• **রাসপূর্ণিমা উৎসব**—কার্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন রাস পূর্ণিমা উৎসব পালিত হয়। ঐদিন কার্তিক ব্রতও উদ্‌যাপন করা হয়।

• **অনন্ত চতুর্দশী উৎসব**---এই উৎসবটি ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দশীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে অনন্ত সায়নকে মহাস্নান করানোর পর ভোগ নিবেদন করা হয় এবং অনন্ত ব্রত পালন করা হয়।

• **নীলাদ্রি মহোদয় উৎসব**—বৈশাখ মাসের শুক্লা অষ্টমীতে এই উৎসব পালিত হয়। এই দিন জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা সমাপনের পর দেবতারা যজ্ঞশালা থেকে অন্তর্বেদীর উপর আরোহণ করেছিলেন। দেবতাদের ভোগ নিবেদন এবং নিবেদনের সঙ্গে ১০৮ ঘড়া পুণ্যজল নিবেদন করা হয়ে থাকে।

• **নৃসিংহ জন্মোৎসব**—বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের ১৪তম দিনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে নৃসিংহদেবকে শোভাযাত্রা সহকারে জগন্নাথবল্লভ মঠে নিয়ে যাওয়া হয়। দিনের শেষে আবার নৃসিংহদেবকে মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। এই দিনটি নৃসিংহদেবের জন্মদিন মনে করা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি মেনেই সকল কার্যই করা হয়।

• **শয়ন একাদশী উৎসব**—আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি হল ভগবানের শয়নের উৎসব। জগন্নাথদেব, সুভদ্রাদেবী, ভগবান বলভদ্র এই দিনে বড় রাস্তায় রথের

Scanned with OKEN Scanner

উপরেই অবস্থান করেন। তাঁদের স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়। ভক্তগণের বিশ্বাস যে এইদিন যদি ভগবান দর্শন করা হয় তাহলে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। শয়ননীতি অনুসারে দেবতাদের প্রতিনিধি দেবতা এবং বলভদ্রের প্রতিনিধি দেবতা বাসুদেব সুভদ্রার প্রতিনিধিরূপে ভুবনেশ্বরী এবং জগন্নাথের প্রতিনিধিরূপে নারায়ণকে রথের উপর বিরাজ করানো হয় এবং ভোগ নিবেদন করে পূজ্য করা হয়। এরপরে তাঁদের এক সুসজ্জিত শয়নকক্ষে শয়ন করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিয়ে শয়নঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দেবতারা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য এখানে চার মাস শয়ন করেন।

- **পার্শ্ব পরিবর্তন উৎসব**—এই উৎসবটি ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন ঠিক সন্ধ্যার সময় সারাদিন ধরে যেসব নিয়মনীতি আছে সব কিছু পালনের পর যখন দেবতাদের শয়ন করানো হয় তখন এই নীতি পালন করা হয়। দেবতারা যেদিন পাশ ফিরে শুয়ে নিদ্রা যান ঠিক তার উল্টোদিকে মুখ করে শোয়ানো হয় দেবতাদের। যদি দেবতারা দক্ষিণ দিকে মুখ করে ঘুমান তাহা হলে তাদের উত্তর দিকে মুখ করে ঘুম পাড়ানো হয়। একেই বলা হয় 'পার্শ্বপরিবর্তন উৎসব'।

- **সহস্র কুম্ভ অভিষেক উৎসব**—এই উৎসবকে দুর্গাপূজা বা দুর্গা জন্মও বলা হয়। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে এই উৎসব পালন করা হয়। এই দিন থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬ দিন বিমলা দেবীর মন্দিরে দুর্গাপূজা হয়। শ্রীমাধবের বিগ্রহ মূল মন্দির থেকে নিয়ে এসে মা বিমলাদেবীর পাশে বসানো হয় এবং আটদিন ধরে পূজাপাঠ করা হয়। আটদিন পরে শ্রীমাধব ও মা বিমলাদেবীকে দোলমণ্ডপ সাহীর নারায়ণী মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে

Scanned with OKEN Scanner

বাকি আটদিন তাদের পূজা করা হয়। দেবীকে ১৬ দিন ধরে বিভিন্ন রকম বেশভূষায় সজ্জিত হয়।

• **দেব দীপাবলী উৎসব**—অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ দিন থেকে পঞ্চদশ দিন পর্যন্ত মহাপ্রভু জগন্নাথদেব তাঁর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে বাতি দান করেন। এই দিনে মন্দিরেও দীপ জ্বালানো হয়। এই তিনটি দিন ভগবান মহাপ্রভু নন্দ, বাসুদেব ও দশরথের উদ্দেশ্যে পিতৃশ্রাদ্ধ ও দীপদান করেন। সাধারণ মানুষকে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভগবান এই নীতিটি পালন করেন।

• **গামছা পূর্ণিমা বা বলভদ্র জন্ম**—এই পূর্ণিমাকে রাখীবন্ধন পূর্ণিমাও বলা হয়। শ্রাবণ পূর্ণিমায় এই উৎসব পালন করা হয়। এই দিন দেবতাদের সোনা ও পাট-সুতার রাখী পরানো হয়।

• **বামন জন্ম উৎসব**—ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে বামন জন্ম উৎসব পালন করা হয়। এই দিনে গরুড় পার্শ্ব পরিবর্তন এবং ইন্দ্রধ্বজা পূজা হয়। এই দিন হতে উড়িয়া বর্ষের সূচনা হয়।

• **প্রাবরণ উৎসব বা ওড়ন ষষ্ঠী**—এই উৎসবটি অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে পালন করা হয়। এই দিন হতে দেবতাদের বসন্ত পঞ্চমী পর্যন্ত গরম পোশাক পরানো হয়।

• **প্রথমাষ্টমী উৎসব**—অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই উৎসবটি পালন করা হয়। বাবামায়েরা তাদের প্রথম সন্তানের মঙ্গলার্থে এই দিনটি পালন করা হয়ে থাকে।

• **রুক্মিণী হরণ উৎসব**—এই উৎসব জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর দিনে পালিত হয়। এই দিন জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি দেবতা মদনমোহন বিমলাদেবীর মন্দির থেকে রুক্মিণীকে হরণ করেন। ঐ সময় রুক্মিণী মা বিমলার পূজা করছিলেন। এরপর জগন্নাথদেব ও রুক্মিণীর বিবাহ সংগঠিত হয়।

Scanned with OKEN Scanner

• **বাহুড়া যাত্রা উৎসব**—এই বাহুড়া যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠানটি আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে পালন করা হয়। দেবতাদের পূজা দেবার পর বিশেষ পোশাকে ভূষিত করে প্রত্যাবর্তনের জন্য পরপর রথে উপবিষ্ট করানো হয়। পুরীর রাজা এরপরে কিছু নিয়ম-নীতি পালন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে রথ শ্রীমন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। রথটি পথমধ্যে মাসীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই সময় মাসীমা দেবতাদের পিঠা খেতে দেন। সেখান থেকে ভগবান বলভদ্রের রথ ও সুভদ্রাদেবীর রথ আগে যায়। তারপরে যায় জগন্নাথদেবের রথ।

• **কুমার পূর্ণিমা উৎসব**—আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে কুমার পূর্ণিমা উৎসব পালিত হয়। এই দিন জগন্নাথ মন্দিরের সেবকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে শ্রীমাধব ও লক্ষ্মীদেবীর প্রতিনিধিরূপে পাশা খেলেন। এই খেলায় মাধব পরাজিত হয়ে লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে সাতদিনের জন্য বন্দী হয়ে থাকেন। এছাড়া এইদিন সুদর্শন বাইরে বিরাজ করেন।

• **সপ্তপুরী অমাবস্যা উৎসব**—ভাদ্রমাসের অমাবস্যাকে সপ্তপুরী অমাবস্যা বলা হয়। এই অমাবস্যাতেই এই উৎসবটি পালন করা হয়। এইদিন জগন্নাথদেব সুভদ্রাদেবী এবং ভগবান বলভদ্রকে প্রচুর পরিমাণে সপ্তপুরী নামে একপ্রকার মিষ্টিভোগ হিসাবে দেওয়া হয়।

• **রক্ষা পঞ্চমী উৎসব**—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর দিন এই উৎসবটি নীতি অনুযায়ী পালিত হয়। এই দিন 'রহুরেখা' নামে এক বিশেষ ধরণের গয়না দেবতাদের পরানো হয়।

• **চিতালাগী অমাবস্যা উৎসব**—এই অনুষ্ঠানটি শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার রীতি-নীতি অনুযায়ী পালন করা হয়। স্নান পূর্ণিমাতে দেবতাদের দেহ থেকে যে সকল মূল্যবান সোনার গহনা খুলে নেওয়া হয়েছিল সেইসব গহনা পুনরায় এইদিন তাঁদের পরিয়ে দেওয়া হয়।

• **নবান্ন উৎসব**—এই উৎসবটি পালনের কোনো নির্দিষ্ট দিন নেই। নবান্ন উৎসবের দিনটি মন্দিরের জ্যোতিষী জগন্নাথদেবের

Scanned with OKEN Scanner

গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে তিনিই দিনটি স্থির করে দেন। নবান্ন উৎসবে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নির্দিষ্ট ভোগের সঙ্গে আরও কিছু ভোগ নিবেদন করা হয়ে থাকে।

● **জন্মাষ্টমী ও কৃষ্ণলীলা উৎসব**—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। এইদিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি হিসাবে এইদিন মদনমোহনের পূজা করা হয়। মদনমোহনকে উলঙ্গ করে জন্মমণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব রীতি-নীতি মেনেই পালিত হয়।

পুরীর মন্দির

Scanned with OKEN Scanner